নেহরু বাল পুস্তকালয়

নদী কথা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

লেখা : এল. ভালিয়াপ্পা
ছবি : প্রণব চক্রবর্ত্তী
অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

প্রথম প্রকাশ : 1974 (শক 1896)
তৃতীয় মুদ্রণ : 1989 (শক 1911)

মূল্য : 6.00 টাকা
The Story of Our Rivers II (*Bengali*)
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, A-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

Printed at Japan Art Press, A-11, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 028.

শ্রীরঙ্গম মন্দির
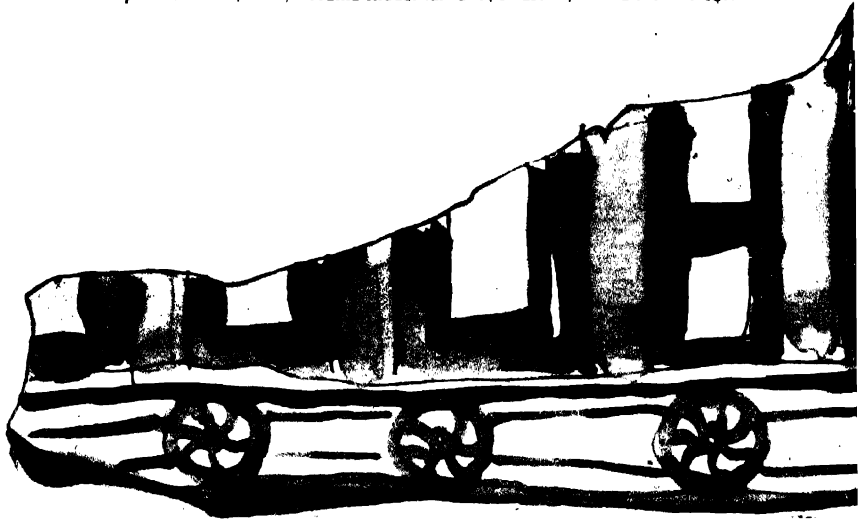
আমাদের নদনদীর কথা

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য আছে।
উত্তর ভারতের নদীগুলিকে বলা চলে চির সলিলা। সারা বছর ধরে তারা বয়ে চলে। শুধু মৌসুমী বৃষ্টিই তাদের জল যোগায় না, হিমালয়ের তুষারগলা জলও তারা পায়।

দক্ষিণের নদীগুলি তুষারগলা জল পায়না। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দুটি বর্ষার জল থেকে তাদের উৎপত্তি, তা' থেকেই তাদের জলের যোগান। বর্ষার সময়ে ও পরে দক্ষিণ ভারতের বেশীর ভাগ নদীই কানায় কানায় ভরে থাকে। তবে গ্রীষ্ম আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারা শুকিয়ে ছোট নদীটি হয়ে যায়। দক্ষিণের ছোট নদীগুলির শুকনো বালির চড়ায় গরমের সময়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা করতে দেখা যায়।

তবে আর সব কিছুতে উত্তর ও দক্ষিণের নদীতে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষত, মানুষের রোজকার জীবনে নদীগুলির যে অবদান, তাতে কোন তফাতই নেই। দুই দিকেই নদী নিয়ে অসংখ্য রূপকথা আছে। একই ভাবে নদীগুলিকে পূজা করা হয়। তাদের নিয়ে গান গাওয়া হয়, তাদের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাল বহনের কাজে নদীগুলি জলপথের কাজ করে। ইঞ্জিনীয়াররা নদীর জলে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করেন। সে জলে চাষের কাজও চলে। আবার তা থেকে বিদ্যুৎও উৎপন্ন হয়।

ভারতের অধিকাংশ মানুষই চাষবাসের কাজ করেন। নয়ত চাষবাসের

সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসা বা শিল্পের কাজ করেন। চাষের জন্যে আমাদের প্রচুর জল দরকার। তাই লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে জলদাত্রী নদীর ওপর।

তাই, বুঝতে পারছ, নদী আমাদের সকলের কাছেই ভারি মূল্যবান। সে নদীর উৎস তুষার ঢাকা হিমালয়ই হোক, বা দক্ষিণ ভারতের বর্ষার জল-ধারাস্নাত কোন পাহাড়ের চূড়োই হোক। শুধু আমাদের কাছে কেন? সভ্যতার প্রত্যূষ থেকে শুরু করে, সারা পৃথিবীতে মানুষ সেই নদীর ওপরই নির্ভর করেছে, যে নদী নানাভাবে মানুষের উপকার করে।

প্রাচীন দিনে বাইরের শত্রুর হাত থেকে নদী মানুষকে রক্ষা করত। এমন কি আধুনিক কালেও অনেক সময়েই নদী কোন রাজ্য বা অঞ্চলের সীমারেখার কাজ করে। আর্য, মিশরীয়, বাবিলোনীয়, আসিরীয়, এইসব প্রাচীনতম সভ্যতা নদীকূলেই গড়ে-উঠেছিল।

কাবেরী

কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু রাজ্য দুটির বুক দিয়ে বয়ে চলেছে কাবেরী নদী।

কর্ণাটক রাজ্যে আছে ব্রহ্মগিরি গিরিমালা। সেখানে, সাগর থেকে 1320 মিটার উঁচুতে অবস্থিত একটি পার্বত্য ঝরনা এর উৎস। এই গিরিমালাটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত। কর্ণাটকে এই পার্বত্য অঞ্চলটি 'কুর্গ' নামে পরিচিত। তোমরা কি কুর্গের নাম শুনেছ? বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের এক নয়নাভিরাম পার্বত্য অঞ্চল কুর্গ। কুর্গের অধিবাসীরা রাজপুতদের মত। তেমনি বলিষ্ঠ আর নির্ভীক, যোদ্ধাদের মত ধরণ-ধারণ তাদের।

শিশুর মতই, নদীর জন্মও এক মহা আনন্দের কথা। সে জন্যে উৎসব করতে ইচ্ছে হয় বই কি। তাই বছরের এক বিশেষ দিনে, হিন্দু বর্ষপঞ্জীর এক সংক্রান্তি তিথিতে, মানুষ গিয়ে ব্রহ্মগিরিতে ভিড় করেন। ছোট একটি কুণ্ডের বুক ফুঁড়ে কাবেরীর উৎস সেই ঝরনাটি কেমন আকাশ পানে উছলে ওঠে, তাই দেখতেই তাঁদের যাওয়া।

সেকালেও পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে চড়াই ভেঙে মানুষ অক্টোবর মাসে কাবেরী নদীর জন্ম বাৎসরিক দেখতে যেতেন। সে পাকদণ্ডীর পথ মূল ঝরনাটিতে পৌঁছবার পাঁচ কিলোমিটার আগেই যেত শেষ হয়ে। বুনো জানোয়ার ঘুরে বেড়াত অনেক। ঝরনাটিই অবশ্য প্রধান দ্রষ্টব্য। তবে যাত্রাপথের চারপাশে প্রকৃতির সৌন্দর্যও কম মনভোলানো নয়। প্রায় পাল্লা দিত তার সঙ্গে। চড়াইয়ের পথে এক জায়গায় একটি শিলাখণ্ড আছে। সেখান থেকে পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। শোনা যায়, অষ্টাদশ শতকে

কর্ণাটকের অন্যতম শাসক টিপু সুলতান কুর্গ আক্রমণ করে ফিরে আসবার সময়ে বিশ্রাম নেবার জন্যে এখানে থেমেছিলেন। একটি শিলাখণ্ডের ওপর
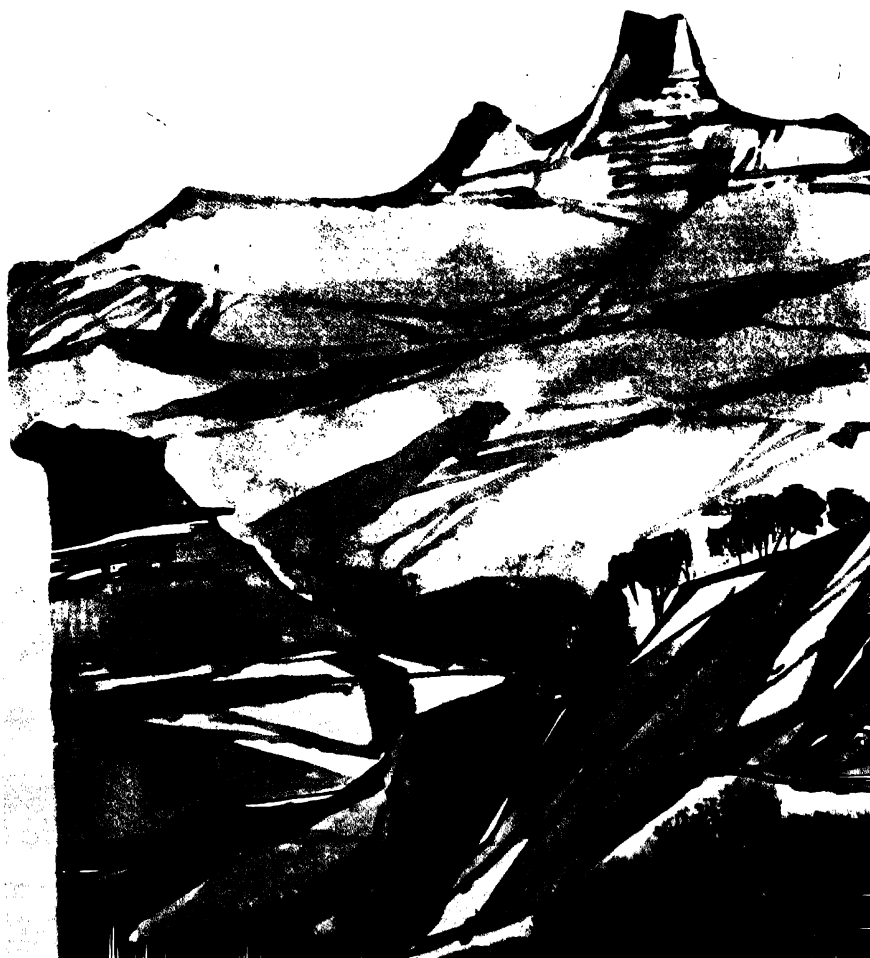
দাঁড়িয়ে তিনি চোখ তুলে পাহাড়টি দেখেছিলেন। চূড়ার কাছে উৎসারিত ঝরনাটি এক ঝলক দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যায় তাঁর। সে দৃশ্য দেখে তিনি

পশ্চিমঘাট

এমনই মোহিত হয়ে যান, যে আপনা থেকেই মাথা নিচু করে সেই নদীর সুন্দর সান্নিধ্যকে নমস্কার জানান। সেই থেকে পাথরটি 'নমস্কার পাথর' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

কাবেরীর উৎস—ঝরনাটির উচ্ছ্বসিত জল যেমন ছোট কুণ্ডটিতে পড়তে থাকে, তেমনি দর্শকরা আনন্দে, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন। কাছেই আরেকটি বড় কুণ্ড আছে। তাঁরা সে দিকে ছুটে যান। ছোট কুণ্ডটির বুক ফুঁড়ে যে ঝরনা উছলে পড়ছে তারই জল এসে পড়ছে এতে। এই জল কুণ্ডে নেমে দর্শকরা তিনবার ডুব দেন। ঝরনার আধার ছোট কুণ্ডটিতে কেউ স্নান করেননা। বড় কুণ্ডটিতে স্নানের অনুষ্ঠান শেষ করে যাত্রীরা ছোট কুণ্ডটির জল আঁজলা করে হাতে নিয়ে মাথায় ছেটান। এও একরকম স্নানই করা হল। কেউ কেউ বাঁশের চোঙায় ভরে ছোট কুণ্ডের জল বাড়ি নিয়ে যায়। গঙ্গাজলের মত কাবেরীর জলও অনেকদিন অবধি নির্মল টলটলে থাকে। সব বহতা নদীর জলই এ রকম। সে সব নদীতে স্রোত থাকে বলে কোন ধুলো ময়লা জমতে সুযোগ পায়না, জলও দূষিত হয়না।

কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে অনেক মেয়ের নামই 'কাবেরী' রাখা হয়। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। নদীর প্রতিটি বাঁক, নদীতীরের প্রতিটি মন্দির নিয়ে অজস্র উপকথা ও কিংবদন্তী আছে। যেমন অগস্ত্যমুনি ও কাবেরী নদীর উৎপত্তির উপাখ্যান।

শোনা যায় ব্রহ্মা, নিঃসন্তান রাজা কাবেরনকে কাবেরী নামে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে উপহার দিয়েছিলেন। পরে অগস্ত্য মুনির মেয়েটিকে ভারি ভাল লাগল। তিনি তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। কাবেরীর বাবা রাজী হলেন, তবে এক শর্তে। অগস্ত্য কখনো তাঁর স্ত্রীকে একলাটি রেখে কোথাও যেতে পাবেন না। অগস্ত্য কথা দিলেন। বিয়ে হল। দুজনে মনের সুখে এক আশ্রমে বসবাস করতে লাগলেন। অগস্ত্য বহুদিন অবধি তাঁর কথা রেখে চললেন। কিন্তু একদিন তিনি তাঁর শিষ্যদের দর্শনের একটি

কঠিন পাঠ শেখাতে শুরু করলেন! সেদিন পড়া চলতেই থাকল। অগস্ত্য ঠিক সময়ে ফিরতে পারলেন না আশ্রমে। কাবেরী অগস্ত্যের জন্যে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর মনে হল বুঝি বা অগস্ত্যের কোন বিপদ আপদ হয়েছে। যদি মন্দ কিছু হয়ে থাকে তবে তিনি আর বেঁচে থাকেন কেন? কাবেরী আত্মহত্যা করতে চললেন। যে কুণ্ডে অগস্ত্য রোজ স্নান করেন, তাতেই কাবেরী ঝাঁপ দিলেন। কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারলনা। কিন্তু তিনি মরলেন না। জলের তলা থেকে তিনি মাটির নিচে তলিয়ে গেলেন। সেই থেকে নদী হয়ে কাবেরী ব্রহ্মগিরি পাহাড় দিয়ে বয়ে চললেন। পাহাড়ের চুড়োর কাছে ঝরনা হয়ে তিনি দেখা দিলেন। কাবেরীকে আকাশে পাতালে খুঁজে খুঁজে একদিন অগস্ত্য পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলেন। ঝরনাটি দেখেই কাবেরীকে চিনলেন তিনি। বাড়ি ফেরার জন্যে কতই অনুনয় জানালেন। অনেক কাকুতি মিনতির পর কাবেরী ফিরতে রাজী হলেন, তবে তিনি বললেন, ‘এখন থেকে আমার আধখানা আশ্রমে
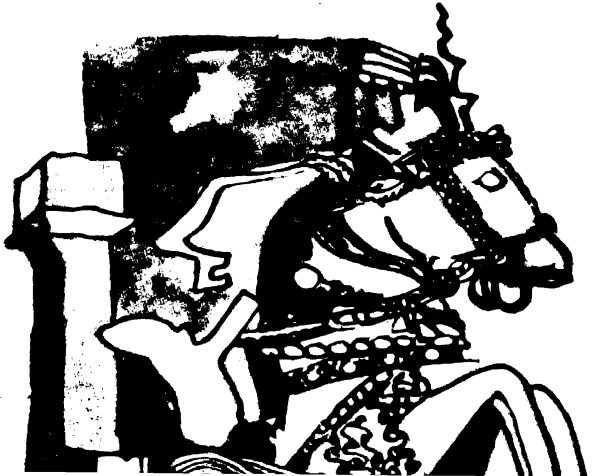
তোমার কাছে থাকবে। বাকি আধখানা কাবেরী নদী হয়ে মা বসুমতীকে জল দেবে।' তিনি কুর্গবাসীদের কথা দিলেন, যেখানে তিনি ঝরনা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, ঠিক সেই জায়গাটিতে বছর বছর দেখা দেবেন। মানুষ বিশ্বাস করে, প্রতি বছর তিনি সে কথা রাখতে দেখা দেন।

নদীতে শুধু জল নয়। নদী একটা জীবন্ত, চলন্ত, সক্রিয় শক্তিও বটে। নদী দৃশ্য আর অদৃশ্য দু'রকম প্রাণশক্তির আশ্রয় এবং আবাস। নদী প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে, আবার ধ্বংসও করতে পারে। যে মাটির বুক দিয়ে নদী বয়ে যায়, সে মাটির রঙের সঙ্গে নদীর রংও বদলায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নদীর আয়তনও বদলায়। এমন কি স্থান থেকে স্থানান্তরে একই নদীর জলের স্বাদও বদলায়। প্রতি নদীর এক নিজস্ব, একান্ত স্বভাব আছে। কবিরা নদীর মন বুঝতে পারেন। ইঞ্জিনীয়াররা সেতু ও বাঁধ তৈরির আগে নদীটি পরীক্ষা করে নেন। মাঝি ও চাষী নদীকে ভয় করে চলেন। কাবেরী নদীরও নিজস্ব একান্ত এক বৈশিষ্ট্য আছে। 765 কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর ধরণধারণও একেক জায়গায় একেক রকম। এক জায়গায় এ নদী বহু উপনদীর জলে স্ফীত, বিশাল, সেখানে এর নাম 'অখণ্ড কাবেরী'। তামিলনাড়ু রাজ্যে ঢোকবার মুখে এর নাম 'মেঘা তাডু' বা 'আডু থান্‌পুম কাবেরী', অর্থাৎ ছাগল লাফিয়ে পেরোতে পারে, কাবেরী সেখানে এমনই সরু। কর্ণাটকের বৃন্দাবন উদ্যানে কাবেরী কুল কুল শব্দে মৃদু স্বরে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। আবার শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতে কাবেরী যেমন সুন্দর, তেমনিই ভয়াল। দৈত্যের মত গর্জনে পাহাড়চূড়া থেকে বাতাসে রামধনু ছিটিয়ে কাবেরী নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শ্রীরঙ্গমে কাবেরী এক পবিত্র নদী। শ্রীরঙ্গপত্তনমে কাবেরী পাখিদের জন্যে এক আবাস সৃষ্টি করেছে। বছরের একেক সময়ে কাবেরী এতই শান্ত, যে ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে তার জলে সাঁতার কাটে। আবার অন্য সময়ে পাড় ছাপিয়ে এ নদী উন্মত্ত স্রোতে ক্ষেত ভাসিয়ে ছুটে যায়, সামনে যা কিছু পড়ে সব ধ্বংস করে। কাবেরী শুধু একটি নদী নয়। অন্যান্য বড় নদীর মতই, অনেকগুলো ছোট নদী মিলে একটি নদী। কাবেরী যেখানে বঙ্গোপসাগরে পড়ছে, তার কাছাকাছি কাবেরী-পুম্পত্তিনামে সে শীর্ণ,

স্বল্পতোয়া। দেখে মনে হয় দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে কাবেরী যেন বৃদ্ধ, ক্লান্ত। সকল জলের জনক মহাসমুদ্রের কোলে বিশ্রাম করবার জন্যে কাবেরী যেন এখন প্রস্তুত। কাবেরীর উৎপত্তি ব্রহ্মগিরির চূড়া থেকে আরবসাগর দেখা যায়। তারপর দীর্ঘ ছন্দ, মনোরম গতিতে এঁকেবেঁকে কাবেরী ভারত উপমহাদেশের পুবদিকে মহাসমুদ্রে গিয়ে মিলেছে।

উৎস-মুখ থেকে বেরিয়ে কাবেরী যেমন ব্রহ্মগিরি পাহাড় বেয়ে নেমে সমতলে প্রবেশ করে, তেমনি কনকা ও গাজতি নামে ছুটি ছোট নদী এসে তাতে মেশে। এই তিনটি নদীর সঙ্গমে শোভা পাচ্ছে বহমণ্ডলম্, উত্তর ভারতের প্রয়াগতীর্থের মতই বিখ্যাত এক নগরী। কিন্তু কাবেরী এখানেও স্বল্পসলিলা। কাবেরী যখন কুর্গ ছাড়াল, হেমাবতী ও লক্ষ্মণ তীর্থম নামে ছুটি নদী এসে তাতে মিলিত হল, তখন থেকেই কাবেরী চওড়া, গভীর, একটি বড় নদী হয়ে দাঁড়ায়।

সম্বৎসর চাষের জল যোগাবার জন্যে শুধু কর্ণাটকেই কাবেরীর ওপর বারোটি বাঁধ তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম হল কান্নামবাদি বাঁধ। তা এখানেই তৈরি হয়েছে।

মানুষ যখন নদীতে বাঁধ দিতে শেখেনি, তখন গ্রীষ্মে চাষীর জমি শুকিয়ে যেত, শস্য জলাভাবে নুয়ে পড়ত, মাটিতে বীজ বুনলে চারা গজাত না কেননা মাটিতে আর্দ্রতা থাকত না। তবে নদীজল সঞ্চয় করে রাখবার জন্যে যেদিন থেকে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে চাষীরা যখনই চান, তখনই জল পাচ্ছেন। এখন বছরে ছু'বার, এমনকি তিনবার চাষও সম্ভব হচ্ছে।

নদীতে বাঁধ দেওয়া সোজা কাজ নয়। তবু আমরা গর্ব করতে পারি, যে 'স্টোন অ্যানিকাট' নামে কাবেরীর বুকে প্রাচীনতম বাঁধটি 1600 বছর আগেই তৈরি হয়েছিল, নাকি তা 1800 বছর আগে? এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাবেরীর ছু'ধারে 160 কিলোমিটার ধরে যে পাঁচিলের

গাঁথনি আছে, এখন সুনিশ্চিত জানা গেছে তা রাজা কারিকলের কীর্তি। এই চোল রাজা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, এই কারিকলই 'স্টোন অ্যানিকাট' তৈরি করেছিলেন। এই প্রাচীন বাঁধটি যে যুগে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়, সে যুগে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে যা বুঝি, তা অজানা ছিল। পাথর ও কাদায় তৈরি এ বাঁধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে এ সম্ভব হয়েছিল ভেবে মানুষ বিস্মিত হয়। উনবিংশ শতকে এটিকে আরো বড় করে মেরামত করা হয়। নতুন নামকরণ হয় 'গ্র্যাণ্ড অ্যানিকাট'। তামিলনাড়ুর নদী দৃশ্যে বিশাল 'গ্র্যাণ্ড অ্যানিকাট' এক দেখার জিনিস বটে।

নদীতে বন্যা এলে তা প্রাণনাশা ও ক্ষতিকারক হতে পারে। তবে মানুষ যদি আগে জানতে পারে যে বন্যা আসছে যদি সাবধান হতে পারে, তবে বন্যাজনিত ক্ষতি অনেকটা এড়ানো যেতে পারে। কাবেরীর বন্যার বিরুদ্ধে শুধু সতর্কই হন না তামিলরা, তাঁরা আরো একটি কাজ করেন। 'আঠার তারিখের বন্যা' নামে একটি উৎসব করে তাঁরা এই বন্যাকে অভিনন্দন জানান। 'আড়ি' (জুলাই—আগষ্ট) মাসের আঠার তারিখে তাঁরা হাজারে হাজারে এসে নদীকে পূজা নিবেদন করেন। তাঁরা মঙ্গলদীপ জ্বালেন। ফল, ফুল ও মিষ্টান্ন জলে ফেলে নদীকে কৃতজ্ঞতা জানান। এ দিনটি মানুষের কাছে আনন্দের দিন। নদীতীরে বনভোজনের দিন।

তোমরা কি জান কে কর্ণাটকে কাবেরীতে কান্নামবাডি বাঁধ তৈরি করেছিলেন? একটা গল্প বলি শোন। একশো বছরেরও বেশি আগে মহীশূরের একটি গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত ক্লাস হচ্ছিল। পরের পাঠটি ভাল স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষক সে কথা ছাত্রদের বলছিলেন। হঠাৎ কথা থামিয়ে তিনি একটি ছেলেকে দেখলেন। ছেলেটি রোগা, ফর্সা, চোখ দুটো এত বড় যে মুখ চোখে পড়েনা। ছেলেটি হাঁ করে শিক্ষকের কথাগুলো যেন গিলছিল। শিক্ষক বললেন, 'আমরা ভাল স্বাস্থ্যের কথা বলছি। কিন্তু বিশ্বেশ্বরন্‌কে দেখ। ওর বয়স কম। শরীরে শক্তি থাকা উচিত। কিন্তু

দেখ ও কি ডিগডিগে রোগা। যদি ওর স্বাস্থ্য এ রকমই থাকে, তবে ও তিরিশ বছরের বেশি বাঁচবে না।'

কিন্তু বালক বিশ্বেশ্বরণের জীবন তিরিশ বছরে শেষ হয়ে যায়নি। বড় হয়ে তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প ইঞ্জিনিয়ার হন। ভারতীয় নাগরিককের পক্ষে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' লাভ করেন। তার চেয়েও বড় কথা হল, স্বচক্ষে তিনি দেখে যান, সমগ্র জাতি তাঁর 101 বছরের জন্মদিন পালন করছে। ভারতে সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়ার স্থান অতি উচ্চে।

দীর্ঘ জীবনে তিনি এত কাজ করে গেছেন, যে তাঁর সম্বন্ধে কি বলা যাবে। কোথা থেকে শুরু করতে হবে, তা ঠিক করাই মুশকিল। স্বাধীনতার আগে কর্ণাটক যখন সামন্ত রাজ্য ছিল, তখন তিনি কর্ণাটকের দেওয়ান হন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর ব্যাঙ্ক, ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য বহু শিল্প উদ্যোগের মূলে তিনি ছিলেন।

স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়াই কান্নামবাড়ি বাঁধ পরিকল্পনা করেন। যেখানে কাবেরীতে এসে হেমাবতী ও লক্ষ্মণতীর্থম নদী পড়েছে, বাঁধটী আছে ঠিক তার একটু বাদে। 40 মিটার উঁচু ও 2600 মিটার লম্বা একটি বাঁধের সহায়তায় একটি হ্রদ বা জলাশয়ে তিনটি নদীর জল সঞ্চয় করা হয়েছে। এই হ্রদের জলরাশির আয়তন সীমা 128 কিলোমিটার। 1191 সালে বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়। শেষ হতে 12 বছর লাগে। যে হ্রদটী তৈরি হয়, কর্ণাটকের তৎকালীন রাজার নামানুসারে তার নাম রাখা হয় কৃষ্ণরাজা সাগর।

কৃষ্ণরাজা সাগরের তীরে আছে মহীশূরের অন্যতম সুন্দরতম উদ্যান। পুরাণে বিখ্যাত যে অরণ্যকাননে কৃষ্ণ শৈশবে ও বাল্যে খেলা করতেন, তার নামে এর যোগ্য নামকরণ হয়েছে—বৃন্দাবন উদ্যান। বৃন্দাবন উদ্যানে

মানুষের শিল্পশৈলী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটেছে। এখানে সব কিছুই দর্শককে মোহিত করে। কাবেরীর জলধারা মৃদুমর্মরে গান গেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। রাতে বিদ্যুৎআলোর অপূর্ব কৌশলে বাগানটিকে মনে হয় পরীর দেশ। ফোয়ারার জল ছিটিয়ে বাতাসকে শীতল রাখে।

চারদিকে রঙিন ফুলের সমারোহ, নানাগঠনে ছাঁটাই করা কুঞ্জ, রেশমের গালচের মত নরম ঘাস, সব মনকে আনন্দে ভরে তোলে। এক সময়ে এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ছিল। মানুষ এখানে আসতে ভয় পেত। আজ এটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি পর্যটন কেন্দ্র। এখন প্রতিটি বাঁধের কাছেই একটি করে সুন্দর বাগান আছে। বৃন্দাবন উদ্যানই পথ দেখিয়ে পথিকৃতের কাজ করেছে।

কর্ণাটকে অবস্থিত কাবেরীর বাঁধগুলির মধ্যে কান্নামবাডি বাঁধই প্রথম ও বৃহত্তম। তামিলনাড়ুতেও অনেক বাঁধ আছে। তিনটি অ্যানিকাট আছে : গ্র্যাণ্ড, আপার ও লোয়ার। সর্বশেষটি অবশ্য কাবেরীর ওপর নয়, কাবেরীর শাখা কোলরুন নদীর ওপর। কোলরুনকে একটি আলাদা নদী বললেও চলে। মেত্তুর বাঁধ সীতা ও পাল গিরিকে যুক্ত করেছে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে কাবেরী দীর্ঘ পথ বয়ে গিয়ে তবে গ্র্যাণ্ড অ্যানিকাটে পৌঁছয়। ভারত স্বাধীন হবার 20 বছর আগে এটি নির্মিত হয়।

কাবেরীর গতিপথে দুটি বড় ও অনেক ছোট জলপ্রপাত আছে। কর্ণাটকে শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাতটির মনোরম দৃশ্য কাবেরীর এক অপরূপ অবদান। এখানে কাবেরীর জলস্রোত 90 মিটার উঁচু পাহাড় থেকে নিচের একটি কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জলের ওপর যে ফেনার রাশি ভেঙে পড়ে তা এতই সাদা, যে মনে হয় কুণ্ডের জল যেন গলিত রুপো। এই রুপোলি মেঘের ওপর সূর্য-কিরণ ঝলকায়, চারদিকে ছিটোতে থাকে রামধনুর বর্ণালি। এ দৃশ্য এমনই মনোহর যে জলপ্রপাতটির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকলেও ক্লান্তি আসে না।

কর্ণাটক ছেড়ে তামিল দেশ তামিলনাড়ুতে কাবেরীর প্রবেশ পথে আছে দ্বিতীয় জলপ্রপাতটি। এর নাম হোকনগল জলপ্রপাত। কানাড়া ভাষায় 'হোক' মানে ধোঁয়া। জলপ্রপাতটির স্রোত যখন নিচের পাথরে আছড়ে পড়ে, জলকণা অনেক উঁচু অবধি উৎসারিত হয়। দূর থেকে

দেখলে মনে হয় ধোঁয়া। মেত্তুর বাঁধ হোকনগল জলপ্রপাত থেকে বেশি দূরে নয়।

নদীর জল সরাসরিই সেচের কাজে লাগানো চলে। কৃষ্ণরাজা সাগর বাঁধে সঞ্চিত জল, জালের মত অসংখ্য খাল দিয়ে হাজার হাজার একর জমিতে গিয়ে পড়ে। সেখানে খাদ্যশস্য, তরিতরকারি ও ফলের চাষ হয়। জলের অন্য এক ব্যবহারও আছে। জলের তোড়ে যে শক্তি আছে, তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা চলে। এই উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নাম হল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত সৃষ্ট হয়েছে দুটি নদীর সংযোগে। কাবেরী, পরাসুখী ও গগনসুখী, দুটি নদীতে বিভক্ত হয়ে গেছে সেখানে। শিবসমুদ্রম্ মেঘ গর্জনে পাহাড় চূড়া থেকে নিচে পড়ছে। তার জল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। সত্যি বলতে কি, শিবসমুদ্রমই হচ্ছে ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি কর্ণাটকের হাজার হাজার ছোট গ্রামে আলো জ্বালায়। রাজ্যের সর্বত্র কল ও কারখানা চালায়। শিবসমুদ্রমের বিদ্যুৎই কোলার স্বর্ণখনি, ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানা, অসংখ্য চিনিকল, সুতা ও রেশম কাপড়ের কল চালায়।

মেত্তুরের জলবাঁধটি দুভাবে ব্যবহার করা হয়। কৃষ্ণরাজা সাগরের মত এর খানিকটা জল খাল দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেচের কাজে লাগানো হয়। বাকিটুকু দিয়ে শিবসমুদ্রয়ের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ হয়। হোকনগল কিন্তু শুধুই একটি সুন্দর জলপ্রপাত। দর্শককে বিনামূল্যে আনন্দ বিতরণ করে। আমরা জানি, কাবেরী যখন বয়ে চলে, কখনও তাতে অন্য নদী এসে মেশে, কখনো বা কাবেরীই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। যাত্রাপথে কাবেরী তিন জায়গায় দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তিন বারই দুটি ধারা কয়েক কিলোমিটার বয়ে গিয়ে আবার এসে একসঙ্গে মিলেছে। যেখানেই তা ঘটেছে, সেখানেই দুটি ধারার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে বেষ্টিত করেছে জল। ভূ-খণ্ডটি দ্বীপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাবেরী সৃষ্ট প্রথম দ্বীপটি আছে মহীশূরে। সেখানে নদী দ্বিধা—বিভক্ত হয়ে দুটি ধারায় 13 কিলোমিটার পথ বয়ে গিয়ে আবার একধারায় মিলিত হয়েছে। কর্ণাটকের রাজাদের এক সময়কার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম্ এই দ্বীপে অবস্থিত। এখানেই টিপু সুলতান ও ইংরেজের মধ্যে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে টিপু প্রাণ হারায়। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক বিখ্যাত পক্ষী অভয়াশ্রয় আছে। ভারতের চারিদিক থেকে পক্ষীপ্রেমিকরা এখানে আসেন। নানা জাতের সারস ও আরো অনেক রকম পাখি এখানে জুন মাসে আসে। জুলাই ও আগষ্টে তারা বাসা বাঁধে।

শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত
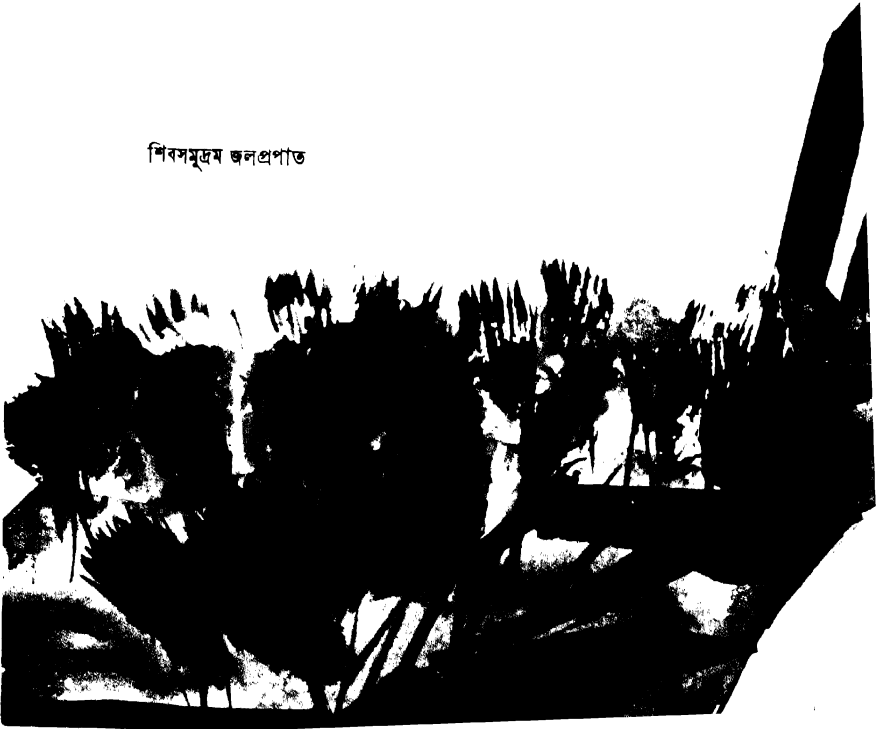
শ্রীরঙ্গপত্তনম্‌কে পেছনে রেখে খানিকটা বয়ে চলার পর কাবেরীতে বহু উপনদী, ঝরনা ও শাখানদী এসে মিশেছে। ফলে কাবেরীর জলভারও বাড়ে, নদীটি চওড়া ও বড় হয়ে ওঠে। খানিক পথ বাদে একটু উঁচু মাটিতে পৌঁছতেই কাবেরী আবার দ্বিস্রোতা হয়ে যায়। তারপর একসঙ্গে মিলিত হয়ে পাহাড় বেয়ে শিবসমুদ্রম্‌ জলপ্রপাত নামে নিচে পড়ে। তবে দুটি স্রোত মিলিত হয়ে জলপ্রপাতটি সৃষ্টি করবার আগে, দুটি ধারাই পাঁচ কিলোমিটার পথ বয়ে যায়। এইখানে শিবসমুদ্রম্‌ নামে

টিপুর প্রাসাদস্থিত চিত্রাঙ্কন
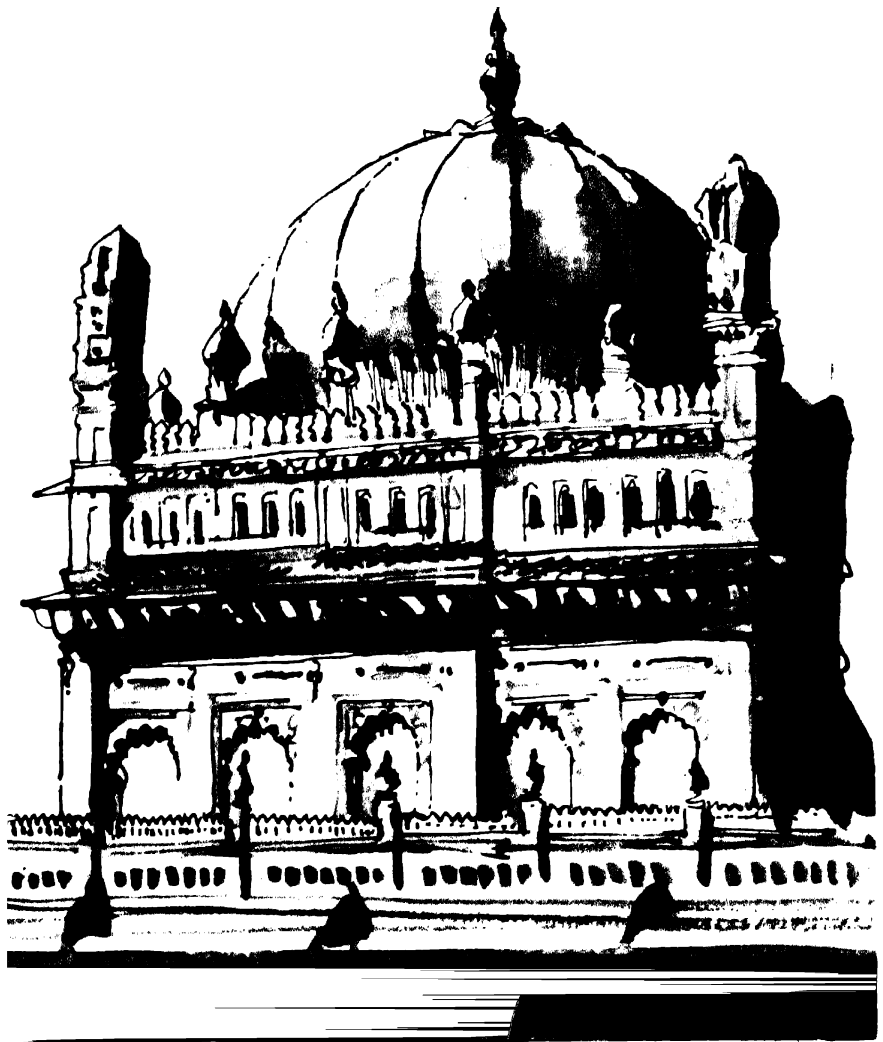
টিপুর সমাধি

দ্বিতীয় দ্বীপটি রচিত হয়। এই দ্বীপটির অধিকাংশই অরণ্যভূমি। তার দৃশ্য সুন্দর। সেখানে প্রচুর বন্যজন্তু আছে।

কাবেরীর বুকে তৃতীয় দ্বীপ হল তামিলনাড়ুতে। এটি সৃষ্টি করেছে কাবেরার শাখানদী কোলরুন। কাবেরী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা এক নদী হিসাবে 43 কিলোমিটার বয়ে গিয়ে কোলরুন আবার কাবেরীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই দ্বীপে আছে সুবিখ্যাত তীর্থ শ্রীরঙ্গম।

পক্ষীর অভয়ারণ্য

কাবেরীর তীরে বহু তীর্থস্থান ও মন্দির আছে। এগুলি পূত পবিত্র-তো বটেই, তবে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর জনসাধারণের কাছে নদীটিই হল সবচেয়ে বড়। কাবেরীর আশীর্বাদে দেখা যায় নদীর দুদিকে মাইলের পর মাইল শস্যশ্যামল ক্ষেত, কলা ও আখের বাগান, মহিমময় উন্নত গাছের সারি। কাবেরীর জল কর্ণাটকের চেহারা পালটে দিয়েছে, তামিলনাড়ুর তাঞ্জোর জেলাকে পরিণত করেছে দক্ষিণ ভারতের শস্যভাণ্ডারে। তামিল ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—কাবেরীর আশীর্বাদে তাঞ্জোর জেলার প্রতি কণা মাটি, একেক কণা সোনার মত দামী।

কাবেরীর তীরে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছে, তাদের ওপরেও কাবেরীর প্রভাব পড়েছে। নদীটিকে নিয়ে প্রতি শহরের নিজস্ব গল্প কাহিনী আছে। সবগুলির কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নদীটিকে নিয়ে নানা উৎসব হয়। তাই নিয়েই বই লিখে ফেলা যায় একটা। দুটি উৎসবের কথা সংক্ষেপে বলা যাক। তামিলনাড়ুতে কুম্ভকোনম নামে একটি শহর আছে। সেখানে প্রতি 12 বছর অন্তর 'মহামাখম' নামে একটি উৎসব হয়। উত্তর ভারতে ত্রিবেণী সঙ্গম বা প্রয়াগের কুম্ভমেলার মতই এটি বিখ্যাত। 'মহামাখম' উৎসবের দিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও যাত্রী, নগরের একটি জলাশয়ে প্রথম বার ও কাবেরীতে দ্বিতীয় বার স্নান করবার জন্যে কুম্ভকোনমে আসেন।

নদীর যাত্রাপথের প্রায় শেষে আছে সুন্দরী নগরী ময়ূরম। এ অঞ্চলের সবুজ মাঠে ও ছায়াশীতল বনে যে অপরূপ ময়ূরের ঝাঁক দেখা যায়, সে জন্যে ময়ূরম বিখ্যাত। তারা প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। মানুষ এই জায়গাটিকে 'মায়িলাডুথুরাই' বা 'নদীর তীরে নাচন্ত ময়ূর'ও বলে থাকে।

থিরুবায়ারু নগরের নাম না করলে কাবেরীর কথা সম্পূর্ণ বলাই হয় না।

যেখানে চারটি শাখানদী এসে কাবেরীতে এসে পড়েছে, নগরটি সেখানে। নগরীর মন্দিরে দেববিগ্রহের নাম 'আয়রাপ্পান' বা 'পাঁচটি নদীর দেবতা'। কিন্তু থিরুবায়ারুর যশের প্রধান কারণ হল, এই নগরে ত্যাগরাজার জন্ম হয়; কর্ণাটক সঙ্গীত জগতের এই সুবিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা এক ঋষিকল্প মানুষ।

গোদাবরী

দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ নদীই পশ্চিম থেকে পূবে বইছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে তাদের উৎপত্তি। বঙ্গোপসাগরের দিকে তাদের গতি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি শৈলমালায় কাবেরীর উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যের পূর্বগামিনী নদীগুলির মধ্যে দীর্ঘতমা হল গোদাবরী। এর উৎস-ঝরনাটি পশ্চিমঘাটের আরো উত্তর দিকের পাহাড়ে আছে। কাবেরীর চেয়ে গোদাবরী দৈর্ঘে প্রায় দু'গুণ লম্বা। কাবেরীর মতই এর উৎস স্থান থেকে আরবসাগর দেখা যায়। পূবদিকে বয়ে গোদাবরীও বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে।

লোক মুখে গোদাবরী 'দক্ষিণ গঙ্গা' নামে পরিচিত। একে ভারতের অন্যতম পুণ্য নদী মনে করা হয়, কেননা 'রামায়ণ'-এর কাহিনীর সঙ্গে এ নদী সম্পর্কিত। এর প্রতিটি বাঁক, নদীবক্ষের বড় পাথর, ছোট নুড়ি, সব কিছুরই রাজা রামচন্দ্রের পুণ্য কাহিণীতে কিছু না কিছু ভূমিকা আছে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন। গোদাবরী তীরের অসংখ্য নগর, অরণ্য ও গ্রাম দাবী করে—রাম, তাঁর ভাই লক্ষ্মণ, স্ত্রী সীতা, হয় সেখান দিয়ে গিয়েছিলেন, নয় সেখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

ধরা যাক পঞ্চবটি। জায়গাটি নাসিকের কাছে। লোক বিশ্বাস, এই হল বাল্মীকির রামায়ণে উল্লিখিত সেই পঞ্চবটি, অযোধ্যা ত্যাগের পর যে পঞ্চবটিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। লোকের বিশ্বাস, এখানেই লক্ষ্মণ লঙ্কার রাজা রাবণের বোন শূর্পনখার নাক কেটেছিলেন।

শূর্পনখা অযোধ্যার ভাবী রাজা প্রিয়দর্শন রামকে দেখতে এসেছিলেন। তারপর তাঁকে ভালবেসেছিলেন। কাহিনীতে আছে, সূর্পনখা এমন দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, যে লক্ষ্মণ রাগ সামলাতে না পেরে তাঁর নাকটা কেটে শাস্তি দেন।
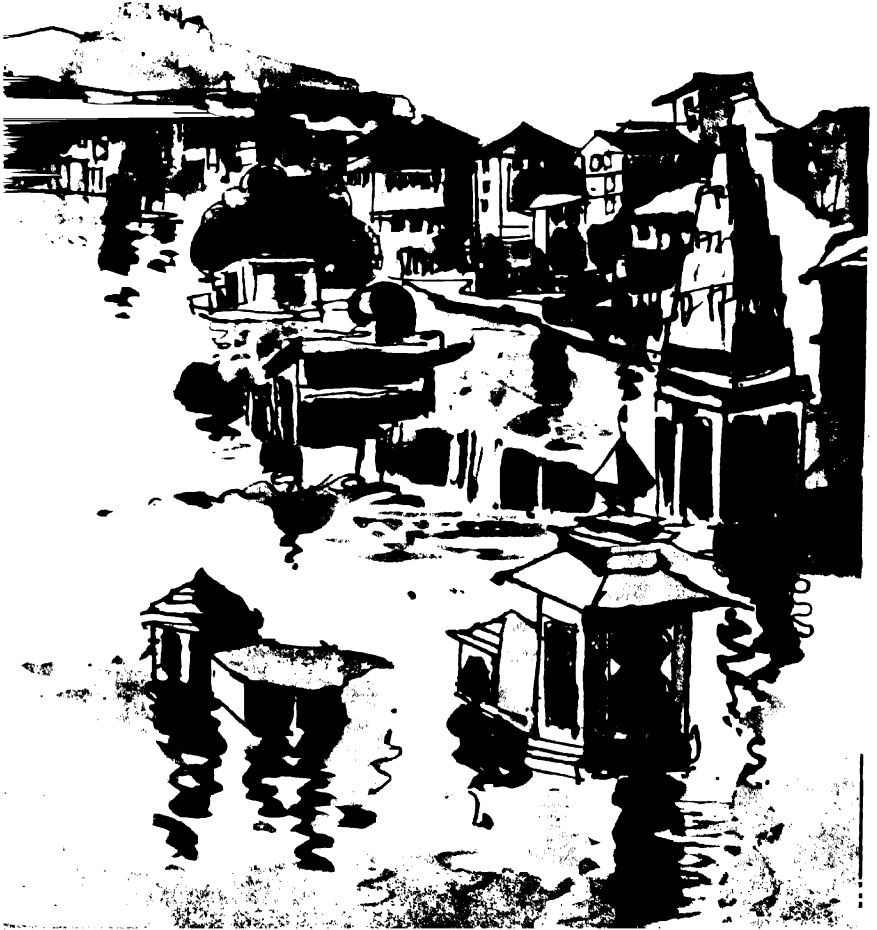
শোনা যায় পিতা, রাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গোদাবরীতেই রাম ও লক্ষ্মণ স্নান করে শুদ্ধ হন। হিন্দুদের নিয়ম হল, কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারা গেলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। নাসিকের কাছে এই গোদাবরীতেই, ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে জননীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গান্ধীজি স্নান করে শুদ্ধ হন।

কাবেরীর মতই, গোদাবরীও যেমন বয়ে চলে, শাখা নদীগুলি দলে দলে এসে তাতে পড়ে। প্রথম শাখা নদী হল প্রাণহিতা। মহারাষ্ট্রে এর উৎস। তারপর ইন্দ্রাবতী ও রামের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত শবরীর নামানুসারে শবরী নদী এসে গোদাবরীতে মেশে। এতগুলি বড় ও ছোট নদী এসে পড়ার ফলে গোদাবরী পুরো চার কিলোমিটার চওড়া হয়ে দাঁড়ায়! অবশ্য যাত্রাপথের সর্বত্র নদীর এই বিস্তার সমান থাকে না। পূর্বঘাট পর্বতমালার দিকে বয়ে চলতে চলতে মাঝে মাঝেই নদীটি সংকীর্ণ হয়ে যায়। তারপর গোদাবরী যখন আগেকার রাজামহেন্দ্রবরম, বর্তমানের রাজামুন্দ্রিতে পৌঁছয়, তখন সে আবার এক বিশাল, প্রশস্ত নদী। রাজামুন্দ্রিতে গোদাবরীর বুকে যে রেলসেতু আছে, তা দেখলেই সেখানে নদীর বিশাল বিস্তার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। বলা হয়, 56টি খিলান যুক্ত এই সেতু, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু।

বিশাল, ছড়ানো শহর রাজামুন্দ্রির ঐতিহ্য ও ইতিহাস দুই আছে। এই শহর বহু কীর্তিত রাজবংশের উত্থান ও পতনের সাক্ষী। প্রতি 12 বছরে এখানে যে 'পুষ্কর' উৎসব হয়, তা প্রয়াগের 'কুম্ভমেলা' ও কুম্ভ-কোনমের 'মহামাখম' উৎসবের মতই বিখ্যাত। তাতে তেমনি ভিড়ই হয়। গোদাবরী তীরে এখানে দুই আশ্চর্য দেবতার মন্দির আছে। মার্কণ্ডেয় ও কোটিলিঙ্গেশ্বরের। ভক্তদের কাছে মন্দির দুটির বিশেষ আকর্ষণ আছে। রাজামুন্দ্রিতে বহুদিন ধরে বহু বিশিষ্ট কবি, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার বাস করে আসছেন। একাদশ শতকের বিখ্যাত প্রাচীন কবি নান্নায়া এক আধুনিক তেলুগু গদ্য সাহিত্যের পথ প্রদর্শক বীরসলিঙ্গম পাণ্ডুলু

এখানেই জন্মেছেন, এখানেই বাস করেছেন। আজও এ শহর সাহিত্য সেবার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র।

রাজামুন্দ্রিতে পৌঁছবার আগে আমরা রামের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি শহর গোদাবরী তীরে দেখতে পাই। তা হল ভদ্রাচলম। গোদাবরীকে কেন্দ্র করে যে বহুমুখী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এই শহর তার সবটুকু পরিচয় বহন করছে। মনে করা হয়, এখানে পাহাড়ের ওপর যে রাম মন্দির আছে, রাম মন্দিরগুলির মধ্যে তার জায়গা সবার ওপরে। পুরাণে আছে, ভদ্রাচলম থেকে 30 কিলোমিটার দূরে পর্ণশালা নামে যে জায়গাটি আছে, সেখান থেকেই লঙ্কারাজ রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। এই ভদ্রাচলমেই রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কা যাবার পথে গোদাবরী পার হন।
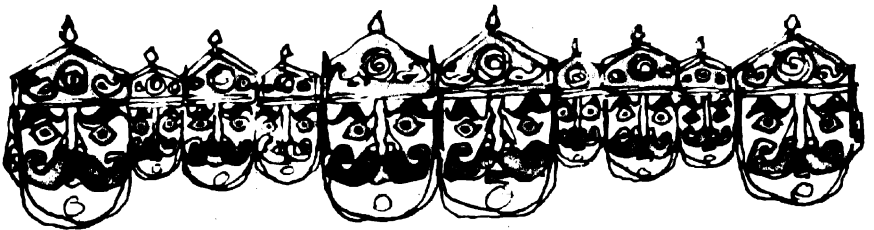
রামের এক শ্রেষ্ঠ ভক্ত রামদাসের শহর হিসাবে ভদ্রাচলম আরো বিখ্যাত। রামদাসের গান ভারতে কবীর ও মীরার সঙ্গীতের মতই সুপরিচিত। রামদাসের কাহিনী সত্য কাহিনী, রামদাস পুরাণের মানুষ নন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি। রামদাস তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম ছিল গোপান্না। তিনি ছিলেন একজন তহসিলদার।

কাহিনী আছে, একদিন এই শহরের থিমাক্কা নামে এক বুড়ি, এক পাহাড়ের চূড়ায় জঙ্গলের মধ্যে এক মন্দিরে তিনটি দেববিগ্রহ আছে এই স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নটি এমনই স্পষ্ট, যে সকালে তিনি মেয়েকে নিয়ে সেই পাহাড়ে যান। ঝোপজঙ্গল কেটে পথ পরিষ্কার করে স্বপ্নে ঠিক যেখানে দেখেছিলেন, সেখানে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি খুঁজে পান। আনন্দে ও ভক্তিতে তিনি তাঁর সাধ্যমত জঙ্গল পরিষ্কার করেন। বিগ্রহগুলির মাথার ওপর একটা চালাঘর তোলেন, যাতে বিগ্রহগুলিতে রোদ বৃষ্টি না লাগে। প্রতিদিন তিনি পাহাড়ে উঠে সেখানে পূজো করতে থাকেন। শীঘ্রই গ্রামবাসীরা থিমাক্কার এই পাহাড়ে ওঠার রহস্য নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। থিমাক্কা কি করছেন ভেবে তাঁরা অবাক হন। মানুষ যখন প্রশ্ন করেন থিমাক্কা পাহাড়ে উঠে কি করেন, তিনি উত্তর দেন, রোজ তিনি একটি মন্দিরে যান। উত্তর শুনে সবাই হাসেন। পাহাড়টা ত বন জঙ্গলে ঢাকা। সেখানে মন্দির এল কোথা থেকে ?

তহসিলদার গোপান্নার কানে শীঘ্রই থিমাক্কার এই মন্দির নিয়ে গল্প করার খবর পৌঁছে গেল। গোপান্না, সেই গ্রাম বৃদ্ধার কথা বিশ্বাস করলেন। পাহাড়ে উঠে তিনি নিজেই মন্দিরটি খুঁজতে লাগলেন। তারপর থিমাক্কা যেখানে বলেছিলেন, সেখানেই মন্দিরটি খুঁজে পেলেন তিনি। জঙ্গলের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার। সেখানে একটি চালাঘরে তিনটি বিগ্রহ। সব একেবারে তকতকে পরিষ্কার। মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গোপান্নার মনে সহসা ভাবান্তর হল। বিগ্রহগুলির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না তিনি। এক অনাস্বাদিত আনন্দের তরঙ্গ তাঁর শরীরে খেলে

গেল। মনে হল সমস্ত জীবন ধরে তিনি এই পাহাড়ের চূড়ায় এই মুহূর্ত্তটির জন্যেই যাত্রা করে আসছেন।

গোপান্না সেই পাহাড়েই আশ্রয় নিলেন। বিগ্রহগুলির জন্য এক পাথরের মন্দির তৈরী করলেন। এই ছোট মন্দিরটিতে তিনি যখন পূজো করতেন, তাঁর মুখ দিয়ে কবিতা ও গান আপনি বেরোত। শীঘ্রই ভদ্রাচলমের লোকেরা

ভদ্রাচলম মন্দির
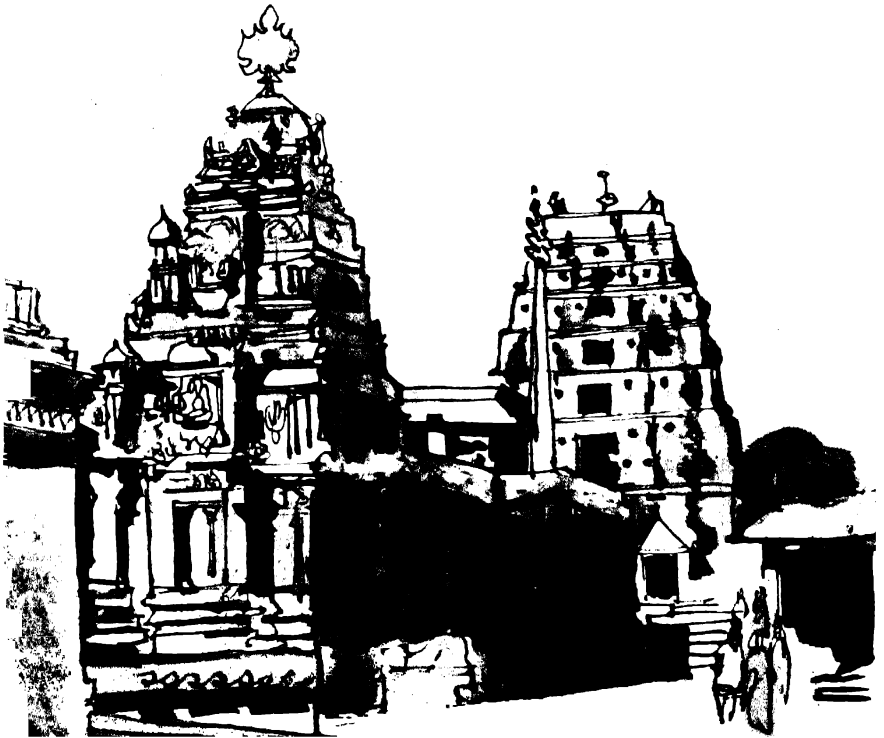
জঙ্গল কেটে পাহাড়ে উঠে গোপান্না ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির দর্শনে আসতে শুরু করলেন। তাঁরা তাঁকে নাম দিলেন 'ভদ্রাচল রামদাস।' গানে ও গল্পে এ নাম অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বত্র সকল মানুষের কাছে সুপরিচিত।

প্রাচীন গ্রাম ভদ্রাচলম এখন এক জনপ্রিয় শহর। সে পাহাড়ের চূড়া অবধি বদলে গিয়েছে। পাহাড়ের ওপর এখন চব্বিশটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক মাঝখানে আছে রামদাসের প্রতিষ্ঠিত পাথরের মন্দির। সে মন্দিরে আছে থিমাক্কার আবিষ্কৃত তিনটি বিগ্রহ। এ মন্দিরে যেতে হলে মোটরবোটে গোদাবরী পেরিয়ে অরণ্যপথ ধরে যেতে হবে।

আগে গোদাবরীর জল পুরোটা কাজে লাগানো হত না। অনেকটাই বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ত। দেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হত। স্যার আর্থার কটন নামে এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী প্রস্তাব করেন, ধবলেশ্বরমে যদি নদীর বুকে বাঁধ তৈরী করা যায়, তবে সেচখাল কাটার পরিকল্পনা করে নদীর জল চাষের কাজে লাগানো যায়। তখন দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যেতে পারে। তাঁর চেষ্টার ফলে 1845 সালে নদীর বুকে ইট পাথরের এক বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু হয়। দু বছরে তা শেষ হয়। তিনটি বড় বড় প্রণালীও কাটা হয়। এগুলির দৌলতে গোদাবরী জেলা দেশের জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম উর্বরতম জেলা হয়ে দাঁড়ায়।

দক্ষিণ ভারতের মানুষ স্যার আর্থার কটনকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন। তিনি সেচ বিভাগে কাজ করতেন। চোল রাজারা কাবেরীর বুকে যে বাঁধ বা 'স্টোন অ্যানিকাট' তৈরি করেন, তা দেখে তিনি বিশেষ অভিভূত হন। তিনি সেটিকে মেরামত করান। কাবেরীর দু পাশের ক্ষেতে জলসেচের আরো সুবিধার জন্য বাঁধটিকে উন্নত করেন। কাবেরীর বুকে মেলানাই নামে অন্য বড় বাঁধটির পরিকল্পনা ও নির্মাণের দায়িত্ব তাঁর ওপরই ছিল। মেলানাই মানে আপার অ্যানিকাট।

এই স্যার আর্থারই বিজয়ওয়াড়ার কাছে কৃষ্ণা নদীতে একটি বাঁধ তৈরী করেন। শুধু বাঁধটি তৈরী করেই ক্ষান্ত হননি তিনি। সেচের জন্য যে হ্রদ ও জলাশয় ছিল, তাতে জল সরবরাহের জন্য খাল কাটবার পরিকল্পনাও করেছিলেন।

গত 120 বছর বা তার বেশি সময়, ধবলেশ্বরমে গোদাবরীর বুকে নির্মিত বাঁধটি ওই অঞ্চলের মানুষের প্রভূত উপকার করেছে। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে বাঁধটির বয়স হয়েছে। এখন ধবলেশ্বরম থেকে প্রায় 64 কিলোমিটার দূরে একটি নতুন বাঁধ তৈরী করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 1970 সালের এপ্রিল মাসে এই নতুন বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পুরণো বাঁধটির পরিকল্পক ও নির্মাতা, ভারতে জলসেচ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অন্যতম পথিকৃৎ স্যার আর্থার কটনের নামে এর নামকরণ হবে।

ধবলেশ্বরম পেরিয়ে গোদাবরী দুটি নদীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পূব দিকের নদীটির নাম গৌতমী গোদাবরী। পশ্চিমগামিনী নদীটির নাম বশিষ্ঠ গোদাবরী। মাঝখানে তৃতীয় একটি শাখা নদী আছে। নাম তার বৈষ্ণব গোদাবরী। মাঝখানে বৈষ্ণব গোদাবরী নামে যে শাখা নদীটি আছে, সেটি আর মূল নদীতে ফিরে যায় না। এই তিনটি শাখা নদী সমুদ্রে পড়বার ঠিক আগে একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল রচনা করেছে। গৌতমী গোদাবরী ইয়েনামের কাছে সমুদ্রে পড়ছে। বশিষ্ঠ গোদাবরী নর্সপুরে ও বৈষ্ণব গোদাবরী নাগরাতে সমুদ্রে পড়ছে।

নদী ও সমুদ্রের সংযোগ স্থলে যে ব-দ্বীপ অঞ্চল গড়ে ওঠে তা সবসময়ে সরস ও উর্বর হয়। ও সব অঞ্চলে জমির জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এক সময়ে গোদাবরীর ব-দ্বীপ অঞ্চল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজকে আকৃষ্ট করেছে। তিনটি জাতিই এখানে বসতি করে কোম্পানি ও কুঠি স্থাপন করেছিল। গৌতমী গোদাবরী যেখানে সমুদ্র পড়ছে, সেই ইয়েনাম নামে অধুনা পরিচিত অঞ্চলটি এখনো ফরাসী অধিকারের চিহ্ন বহন করছে।

জলপথ হিসাবে গোদাবরীর উপকারিতা অনেক। এর বুকে প্রচুর নৌকো চলাচল করে। পথ দিয়ে বা নৌকোয় **না** চাপিয়ে এই নদীর বুকে ভাসিয়ে কাঠের গুঁড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। **শাল** ও **বাঁশ** এই দুই অরণ্যে গোদাবরীর দুই তীর সমৃদ্ধ।
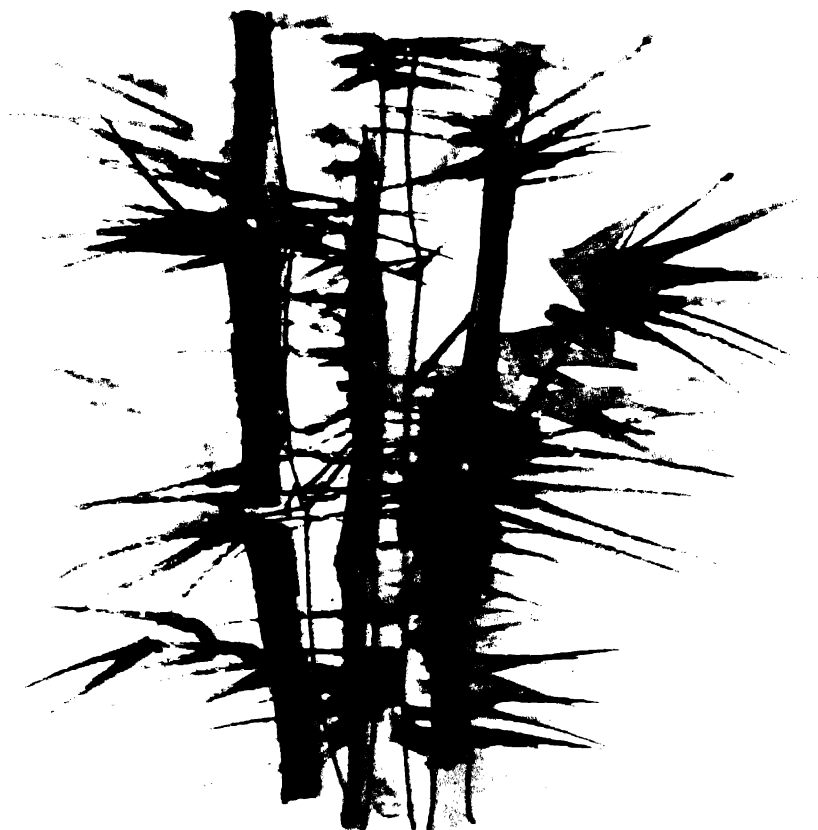
কৃষ্ণা

দক্ষিণ ভারতের যে নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূবে বয়ে গেছে, তাদের মধ্যে দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় হল কৃষ্ণা। এর উৎসও মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। উৎসটি আছে মহাবলেশ্বরে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চোদ্দশ মিটার উঁচুতে। জায়গাটি বথের 145 কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, আরবসাগর থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে, এক ঘন বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে।

গোদাবরী ও কাবেরীর মত কৃষ্ণার উৎসও একটা ঝরনা। এ ঝরনা কখনো শুকোয় না। যে পাথর কেটে ঝরনাটি বেরোচ্ছে, সেটিকে গরুর মাথার আকারে খোদাই করা হয়েছে। তাই মনে হয় গোমুখ থেকেই নদীটি বেরোচ্ছে। নিচের একটি ছোট কুণ্ডে জলটি গিয়ে পড়ছে।

কৃষ্ণা আর গোদাবরী শুধু নদীই নয়। বলা চলে ও দুটি হল অনেক নদীর মিলিত প্রবাহ। কাবেরী হল নদী। সুন্দর, দীর্ঘ, লাবণ্যময়ী, সবার প্রিয় নদী, কিন্তু শুধু একটিই নদী। মাঝে মাঝে তাতে উপনদী এসে পড়েছে বটে, তবে সেগুলি তেমন বড় নদী নয়। ওদিকে কৃষ্ণা ও গোদাবরী দুটি নদীর প্রত্যেকটি বহু নদীর সংযোগে সৃষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণার প্রধান উপনদী 10টি। অন্তত দুটি উপনদী হল বেশ বড়। তাদের আবার নিজস্ব উপনদী আছে। যে দুটি বড় নদী কৃষ্ণাতে এসে পড়েছে, তাদের নাম হল ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা। কৃষ্ণা মহারাষ্ট্র ছাড়িয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবেশ করবার আগেই ভীমা তাতে যোগ দেয়। কৃষ্ণার উপনদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট, সবচেয়ে দীর্ঘ তুঙ্গভদ্রা অন্ধ্রপ্রদেশে কারনুলের কাছে মূল নদীতে এসে পড়ে।

আবার কৃষ্ণার তৃতীয় উপনদীর নাম মুসি। এটি হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে শুরু হয় এবং দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যে গোলকুণ্ডা হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই গোলকুণ্ডা দুর্গের সঙ্গে মুসির ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে।

ভারতের অধিকাংশ নদীর মত কৃষ্ণার তীরেও অনেক তীর্থস্থান আছে। তার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলায় মালভূমিতে অবস্থিত শ্রীশৈলম সবচেয়ে বিশিষ্ট। এই মালভূমির নীচে আছে এক গভীর উপত্যকা। তার বুক দিয়ে কৃষ্ণা বয়ে যাচ্ছে। শ্রীশৈলমের চারিপাশের নিসর্গ দৃশ্য ছবির মত সুন্দর। সেখানে আছে মল্লিকার্জ্জুনের প্রাচীন মন্দির। ভাস্কর্যে, পাথরে অল্প খোদাই করা কারুকাজে ও প্রাচীর চিত্রে সে মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মন্দিরটি সুবিখ্যাত। মন্দিরের তিন কিলোমিটার দূরে পূবদিকে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নেমে এক হাজার ধাপ সিঁড়ি নামলে তবে দেখা যায় নিচে বয়ে চলেছে কৃষ্ণা। এখানে কৃষ্ণার নাম পাতালগঙ্গা, যে গঙ্গা অতলে বইছে। মন্দিরের নথিপত্র থেকে জানা যায় কোণ্ডাভিডুর রেড্ডি পরিবারের এক শাখা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এই সিঁড়িগুলি তৈরি করেন। যে উৎসব শীতের সমাপ্তি ঘোষণা করে, সেই মহা-শিবরাত্রি এ মন্দিরে বিশেষ ভাবে পালিত হয়। সেইদিন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পাতাল গঙ্গায় স্নান করবার জন্য ভিড় করেন ও মল্লিকার্জুনকে একবার দর্শন করবার জন্য মন্দিরে যান।

এ মন্দিরে সবাই ঢুকতে পারেন। এখানে কোন জাতিভেদ মানা হয়না।

মল্লিকার্জুন মন্দির
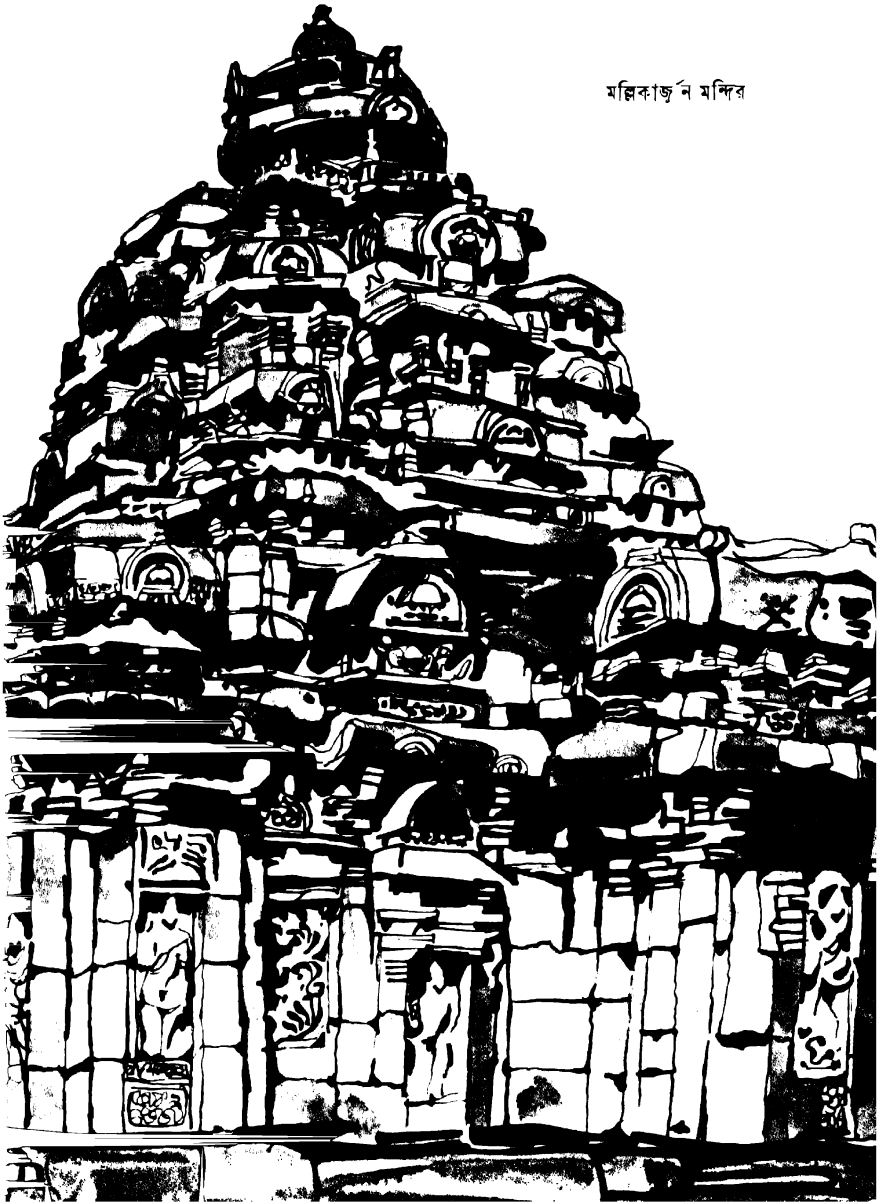
নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই মন্দিরের একেবারে ভেতরে গিয়ে পুজো করতে পারেন। ভক্তরা পাতালগঙ্গা থেকে জল এনে নিজেরা বিগ্রহকে স্নান করাতে পারেন। ভক্তদের এতখানি সুবিধা দেওয়াটা বেশ আশ্চর্য মনে হতে পারে। এর পেছনে একটি কাহিনী আছে। চেঞ্চু নামে এক পার্বত্য উপজাতি এখানে বাস করেন। কথিত আছে, শিব এই উপজাতির লক্ষ্মী নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাই আজ অবধি এই উপজাতিটির মন্দিরে অবাধ অধিকার। চেঞ্চু লক্ষ্মীর মধুর কাহিনী নিয়ে বহু গাঁথা রচিত হয়েছে।

অষ্টম শতকের বিখ্যাত দার্শনিক আদি শঙ্কর, দেশ পর্যটনের সময়ে শ্রীশৈলমে এসেছিলেন ও এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তিনি পাতাল-গঙ্গায় রোজ স্নান করতেন এবং মল্লিকার্জুন ও তাঁর রানীর প্রশান্তিতে যে সব গান তিনি গাইতেন, ভারতের ধর্মীয় কাব্যে তা বিখ্যাত হয়ে আছে।

রায়চুরের কাছে কৃষ্ণা পশ্চিমঘাট থেকে নেমে আসে। পাঁচ কিলো-মিটার পথ যেতে না যেতে কৃষ্ণা প্রায় 120 মিটার নিচে নামে। বর্ষাকালে চারপাশে অনেক মাইল জায়গা জুড়ে জলের মেঘগর্জন শোনা যায়। সেখান থেকে পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে কৃষ্ণা পুবে বিজয়ওয়াড়াতে বয়ে যায়। বিজয়ওয়াড়ার কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে কৃষ্ণার ব-দ্বীপ অঞ্চল শুরু হয়েছে।

বিজয়ওয়াড়া ছাড়িয়ে এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যেখানে কৃষ্ণা বয়ে যাচ্ছে সেখানে 1855 সালে কৃষ্ণার ওপর প্রথম বাঁধটি নির্মিত হয়। এই বাঁধটি তৈরির কাজ শুরু হয় 1853 সালে ও শেষ হয় 1855 সালে। বাঁধটি 1140 মিটার লম্বা। নদীগর্ভ থেকে এর উচ্চতা ছয় মিটার। এই বাঁধে যে নদীজল সঞ্চিত হয় তা এক বিরাট জালের মত অসংখ্য প্রণালী দিয়ে চারপাশের মাটিকে জল দেয়।

এই বাঁধ পর্যন্ত কৃষ্ণা দ্রুতবেগে ছোট ও বড় পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে

আসে তাই তাতে নৌকো চালানো যায়না। তবে বিজয়ওয়াড়া ছাড়াবার পর নদীতে মাছ ধরবার জন্য ছোট ছোট নৌকো ব্যবহার করা হয়।

বিজয়ওয়াড়া শহরটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পুরাণে বলা হয়েছে এই সব পাহাড়েই অর্জুন প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে বাস করেছিলেন। এখানেই তিনি শিবের আরাধনা করেন। তাঁর ভক্তি দেখে খুশি হয়ে শিব তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দেন। সে অস্ত্রের এমন ক্ষমতা যে অর্জুনকে আর কেউ হারাতে পারত না। আধুনিক বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এটি একটি প্রধান রেলওয়ে জংশনও বটে। এখানকার জমি তুলো ও ধান চাষের পক্ষে উপযোগী। একসময়ে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। কৃষ্ণাতীরের শহরগুলিতে যে সব কীর্তিচিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ আছে তাতে সেই কথাই প্রমাণ হয়। অমরাবতী তেমনি একটি শহর। কাহিনী আছে, মৃত্যুহীন মানুষ, যে সব মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভের বর পেয়েছিলেন, তাঁরা একসময়ে এখানে থাকতেন। বর্তমান অমরাবতী শহরের কাছে ছিল ধরনীকোট বা ধান্যকটকম, অন্যতম বিশিষ্ট বৌদ্ধ কেন্দ্র। এটি ছিল সাতবাহন রাজাদের রাজধানী। এখন এটি ধ্বংসস্তূপ। অমরাবতীর স্তূপটি ঠিক সাঁচি স্তূপের মত। তবে আরো বড়।
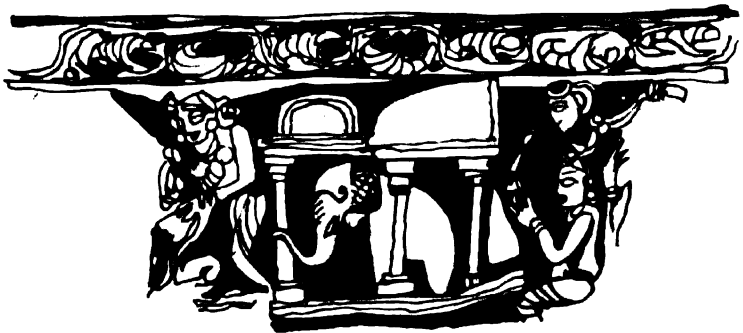
এখানকার বৌদ্ধ ভাস্কর্য সুবিখ্যাত। যেমন দক্ষ হাতের কাজ, তেমনি সুন্দর। দেখলে পরে অন্ধ্রতে দু হাজার বছর আগে যে কলাকুশলীরা বাস করতেন, তাঁদের দক্ষতা ও শিল্পকুশলতার কথা মনে পড়ে যায়।

কৃষ্ণার দক্ষিণ কূলে আছে আরেকটি বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্র, নাগার্জুন-কোণ্ডা। নাগার্জুন নামক মহান বৌদ্ধধর্মাচার্য ও কবির নামে স্থানটির নাম। স্বাধীনতার পরে পরেই সরকার এখানে কৃষ্ণার বুকে বাঁধ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ খানিকটা এগোতে দেখা গেল একটা প্রাচীন নগরী সেখানে চাপা পড়ে আছে। কিছুদিনের মত কাজ থামিয়ে রাখা হল। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থানটি হাতে নিলেন। এই অঞ্চলে তাঁরা যে খনন কাজ চালালেন, তার ফলে একটি সভ্যতা আবিষ্কৃত হল। এই অঞ্চলের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত হল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠ ছিল সেটির, এবং আরো মঠ, স্তূপ ও শিলালেখের অস্তিত্বের প্রমাণ নাগার্জুনকোণ্ডায় আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির নিচের পয়ঃপ্রণালী, মাটির ওপরে সমাধিক্ষেত্র ও স্নানের ঘাটের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। কাছেই একটি পাহাড়ের চূড়োয় প্রত্নশালা বা মিউজিয়ামে সেগুলি প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। অতীতে সিংহল, জাপান, চীন, তিব্বত ও শ্যাম দেশ থেকে ছাত্ররা নাগার্জুনকোণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতেন এমন মনে করবার মত প্রমাণ পাওয়া গেছে। আরো অনেক ঐতিহাসিক তথ্য মাটির নিচ থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে, যা প্রমাণ করছে, একদা কৃষ্ণার কূলে এক অতি উন্নত সভ্যতা বিরাজ করত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং বিজয়-ওয়াড়া, অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডায় এসেছিলেন, সে কথা তিনি লিখে গিয়েছেন।

প্রাচীন নগরী নাগার্জুনকোণ্ডার অবস্থানে এখন কৃষ্ণার বুকে একটি বিশাল পাকা বাঁধ তৈরি হচ্ছে। বিশাল জলাধারাটির নাম হয়েছে

অমরাবতী স্তূপের খোদিত মূর্তি

নাগার্জুনসাগর। মনে করা হয় ভারতের বাঁধগুলির মধ্যে এটি সর্বোচ্চ ও দীর্ঘতম। এখানে যে জলবিদ্যুৎ-প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে, আশা করা যায় তার ফলে এখানে আরো 12 লক্ষ টন ধান, 50,000 টন চিনি পাওয়া যাবে এবং 400 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হবে। এই সব কিছু থেকে প্রতি বছর একশো কোটিরও বেশি টাকা আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিজয়ওয়াড়া ছাড়িয়ে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার গিয়ে কৃষ্ণা দুটি নদীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণার দক্ষিণ শাখাটি পরে আরো ছোট ছোট ধারায় বিভক্ত হয়ে শেষে কয়েক কিলোমিটার গিয়ে মসুলিপট্টমে সমুদ্রে পড়ছে। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে দীভু নামে একটি দ্বীপ আছে। অতীতে চাষের জন্য দ্বীপটিতে পাম্প করে নদীর জল দেওয়া হত। এখন এখানে একটি ছোট বাঁধ নির্মিত হয়েছে। ফলে চাষের কাজে নদীর জল সরাসরি পাওয়া যাচ্ছে।
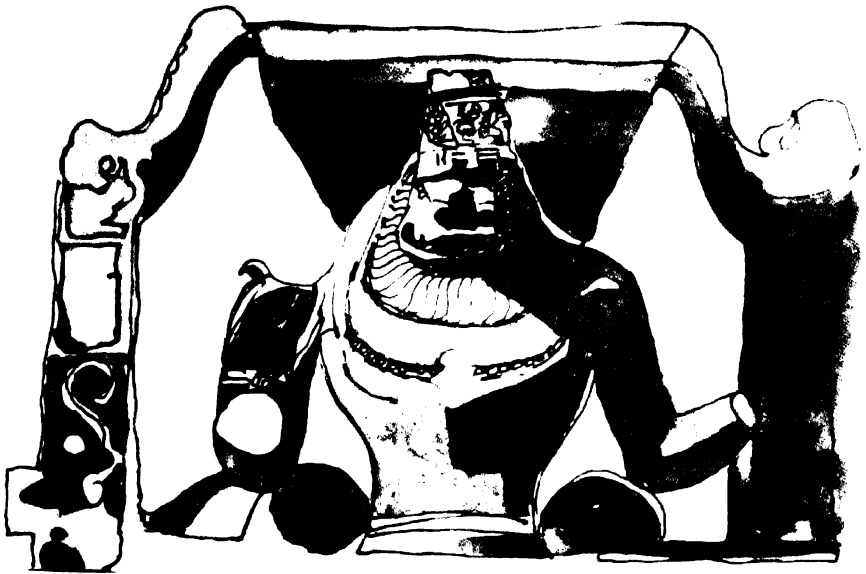
তুঙ্গভদ্রা

তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা নদী সমূহের একটি অংশ, আবার নিজেই সে এক স্বতন্ত্র নদী। স্বতন্ত্র নদী হিসাবে তুঙ্গভদ্রা তিনটি বড় ও তিনটি ছোট নদীর সমষ্টি। কর্ণাটকের চিকমাগালুর জেলায় পশ্চিমঘাটের গঙ্গামুল গিরিশিখরে 1200 মিটার উঁচুতে পরস্পরের কাছাকাছি সেই নদী জলের দুই প্রধান নদী তুঙ্গা ও ভদ্রার উৎস। আদি শঙ্কর যেখানে মঠ স্থাপন করেছিলেন, সেই শৃঙ্গেরী ছাড়িয়ে তুঙ্গা উত্তর-পূবে বয়ে যায়। তারপর তীর্থহল্লীর অপরূপ পর্বতগুহাগুলি দুদিকে রেখে বয়ে চলে যায়। জঙ্গল, বাঁশবন ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলের কফি বাগিচার ভেতর দিয়ে নদীটি বইতে থাকে। বিভিন্ন গিরিমালার মধ্যবর্তী নিচু উপত্যকা দিয়ে বয়ে গিয়ে তবে কুদলির কাছে ভদ্রাতে গিয়ে মেশে। এখান থেকে যাত্রাপথে নদীটির নাম হয় তুঙ্গভদ্রা। কর্ণাটক রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে শরাবতী, কুমদবতী ও বরদা, আরো তিনটি নদী যোগ দেয়। বেদবতী ও হান্দ্রি নদী অন্ধ্রপ্রদেশে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে মিশছে।

তুঙ্গভদ্রার কূলেই স্থাপিত হয়েছিল বিখ্যাত বিজয়নগর সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল বিজয়নগরম। কর্ণাটকে বর্তমান

বেলারি জেলায় ছিল এই রাজধানী। এই অঞ্চলে এখনো সে সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে যখন বিজয়নগরের রাজারা ক্ষমতার তুঙ্গে অবহিত ছিলেন, তখন তাঁরা তুঙ্গভদ্রার বুকে অনেকগুলি পাথরের বাঁধ তৈরি করেন। সেগুলির মধ্যে 10টি এখনো মানুষের কাজে লাগছে।

645 কিলোমিটার ধরে তুঙ্গভদ্রা এক স্বতন্ত্র নদী হিসাবে বয়ে চলে। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষের প্রচুর কাজে লাগে এ নদী। রয়ালসীমা ও রায়চুর জেলা, যেখানে দুর্ভিক্ষ ও খরা লেগেই থাকে, সেখান দিয়ে নদীটি বয়ে যায়। এই সব অঞ্চলকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই তুঙ্গভদ্রা-প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়। এ প্রকল্পে হোসপেটের কাছে মল্লপুরমে নদীর ওপর একটি বাঁধের কথাও ছিল। এই বাঁধের জল বেরোবার যে স্লুইস গেট তা ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররাই পরিকল্পনা করেন ও তৈরি করেন। এই উদ্দেশ্যে একটি কারখানাও স্থাপিত হয়। বাঁধে সঞ্চিত জল চাষের কাজে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে দুই কাজেই ব্যবহার হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যত্রও তুঙ্গভদ্রার

বিজয়নগর মন্দিরের অভ্যন্তরের চিত্র

জল সেচের কাজে ব্যবহার হয়। নদী থেকে দূরে অবস্থিত জলাশয়ে ও ক্ষেতে জল সরবরাহের জন্যে খাল কাটা হয়েছে অনেক। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কডাপ্পা করনুল প্রণালী। তুঙ্গভদ্রা যেখানে কৃষ্ণাতে পড়ছে তার একটু আগে এই প্রণালীটি তুঙ্গভদ্রা থেকে বেরিয়েছে।

তুঙ্গভদ্রার জলের স্বাদ খুব মধুর মনে করা হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই 'গঙ্গা স্নানম্ তুঙ্গা আনম্' প্রবাদটির উৎপত্তি—স্নান কর গঙ্গায় আর জল খাও তুঙ্গার।

নর্মদা

নর্মদা আসলে মধ্যভারতের নদী। মধ্যভারতের পার্বত্যঅঞ্চলের পূর্বভাগে এর উৎপত্তি। এ নদী মধ্যপ্রদেশের বুক দিয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সীমান্ত দিয়ে বয়ে গেছে। তবে সাধারণত এ নদীকে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভাজক রেখা বলে ধরা হয়। ভৌগলিক অর্থে নর্মদা যতটা উত্তর ভারতের নদী, তার চেয়ে বেশী যেন ভারতের উপদ্বীপ অংশের নদী। মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলে যে দুটি বড় পশ্চিমগামিনী নদীর উৎপত্তি তাদের মধ্যে নর্মদাই বড়। আরেকটি হল তাপ্তী। নর্মদা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমারেখা এবং চালুক্য সাম্রাজ্যের উত্তর সীমারেখা যুগ্ম স্থানে সম্মানিত। মহাভারত অনুসারে নর্মদা প্রাচীন অবন্তী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত।

মধ্যভারতীয় পর্বতাঞ্চলের মাইকালা গিরিমালার অমরকণ্টক শৈলশ্রেণীতে নর্মদার উৎপত্তি। এখনো মানুষ এতে বাঁধ দিতে, একে রাগ মানাতে বা আয়ত্তে আনতে পারেনি। উচ্চ পর্বতমালার ভেতর দিয়ে, জঙ্গলের বুক চিরে, গভীর খাত দিয়ে এ নদী বয়ে গেছে। নিচু উপত্যকায় নর্মদা হঠাৎ-হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, বহু জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। কোথাও এর নীল জল মর্মর শৈল ছাপিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কোথাও এর গতিপথ পড়ছে লাল ও হলদে বেলে পাথরের পাহাড়। কোথাও বা এ বইছে বিশাল কয়লা অঞ্চল দিয়ে। 1312 কিলোমিটার পথ গিয়ে এই স্বচ্ছন্দগতি নদী গুজরাটে ব্রোচের কাছে ক্যাম্বে উপসাগরে নিজেকে ঢিলে দিচ্ছে।

কপিল ধারার পাহাড় থেকে 25 মিটার নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে নর্মদা এক

চমকপ্রদ জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। আনন্দিত কল্লোলে মাণ্ডলা পর্বতমালার মধ্যবর্তী বন্দর অঞ্চল দিয়ে ছুটে গিয়ে নর্মদা আবার জব্বলপুরের কাছে ধুঁয়াধর নামে একটি জায়গায় গিরিচূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ছে। তারপর, যেন এই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপির দুরন্ত খেলায় ক্লান্ত হয়ে শান্ত গতিতে মার্বেল পাথরের গা দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার বয়ে গেছে। তারপর বিন্ধ্য ও সাতপুরা গিরিমালার ভেতরের উপত্যকা দিয়ে 320 কিলোমিটার দীর্ঘ এক যাত্রাপথ নর্মদার। জব্বলপুর ও হাণ্ডিয়ার দক্ষিণের এই উপত্যকা নর্মদার পলিমাটির দাক্ষিণ্যে উর্বর। তারপর শুরু হয় পার্বত্য অঞ্চল। নদীর দুধারে পড়ে ঘন জঙ্গল, একদা তা ছিল দস্যু ও পিণ্ডারীদের লুকোবার জায়গা ও বিচরণক্ষেত্র। শেষ পর্যায়ে নর্মদা গুজরাটের সমতলভূমিতে প্রবেশ করে। এখানে নদী নৌকো চলার মত গভীর।

ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী প্রায় সব নদীর উৎপত্তিই এক স্বর্গীয় ব্যাপার। ঐশ্বরিক উদ্ভবের জন্য নর্মদাকে পবিত্র নদী মনে করা হয়। প্রতি বছর ভক্তরা নদী প্রদক্ষিণ করে। নদীটি ঘিরে তারা হাঁটে। ব্রোচে, নদীর মোহনায় যাত্রা শুরু করে যাত্রীরা নর্মদার এক কূল ধরে হেঁটে অমরকণ্টকে যায়। সেখানে পূজা সাঙ্গ করে নদীর অপর কূল ধরে আবার মোহনা অবধি যায়। অধিকাংশ ভারতীয় নদীর মত নর্মদার তীরেও আগাগোড়া তীর্থকেন্দ্র আছে—পরাগত, ওমকার, পার্বনী, কর্ণালী, শুক্লতীর্থম ও ব্রোচ। নর্মদা সৃষ্ট এক দ্বীপনগরী মান্ধাতার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা উচিত। সেখানে এক বিখ্যাত ওঙ্কারনাথ মন্দির আছে। বিশিষ্ট তীর্থস্থান হল মহেশ্বর, এক প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানী, মন্দির ও প্রাসাদে আকীর্ণ এক নগরী। শুদ্ধতীর্থমের কাছে নর্মদার বুকে একটি ছোট দ্বীপ আছে। জনশ্রুতি, কবীরদাস সন্ন্যাসী হয়ে সেখানে এক বটগাছের নিচে বাস করেছিলেন। দ্বীপটিকে আজও বলা হয় 'কবীর'।

নর্মদার বিশিষ্ট উপনদী বাঞ্জার মান্ধাতার কাছে মূল নদীতে পড়ছে। শের ও সক্কর নরসিংহপুরে নর্মদায় পড়ছে। ঠাভা, কঞ্জল ও ছোট ঠাভা

হোসংগাবাদের কাছে নর্মদার মিশছে। উত্তর থেকে একটিই উপনদী বয়ে এসেছে—হিরণ। হিরণ জব্বলপুরে নর্মদায় পড়ছে।
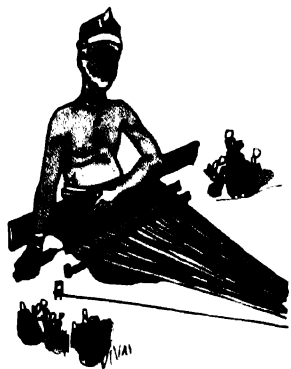
নর্মদার বিষয়ে এক বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যাত্রাপথে এ নদীর বিস্তার বারবার বদলে যায়। আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হল, মোহনা থেকে ভেতর দিকে 88 কিলোমিটার অবধি এ নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। এই দুটি কারণে, এবং পার্বত্য তরাই দিয়ে এ নদী বয়ে যাচ্ছে বলেও নর্মদার জলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না। তবু, কোন চেষ্টা বা উন্নয়ন ব্যতিরেকেই মোহনা থেকে ভেতর দিকে একশো কিলোমিটার অবধি এ নদীতে নৌকো চলে, এই বাঁধনছাড়া নৃত্যপরা নদী 90,000 বর্গ কিলোমিটারেরও বেশী জমিতে জলসেচ করে।

কয়েকটি ছোট নদী

ভারতের উপদ্বীপ অংশের নদীগুলি দু জাতের—অন্তর্দেশীয় ও উপকূল বাহিনী। উপকূলবাহিনী নদীগুলি ছোট স্রোতস্বতী—সংখ্যায় প্রায় 600—পশ্চিম উপকূল ধরে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র থেকে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী পর্যন্ত তারা বয়ে গিয়ে আরবসাগরে মিশছে। পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ অঞ্চলের কয়েকটি নদীও এই দলে পড়ে। অন্তর্দেশীয় নদীগুলি এক হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়। তাদের কয়েকটির কাবেরী, গোদাবরী ও কৃষ্ণার মত পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় উৎপত্তি, তারা বয়ে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। অন্য গুলির, নর্মদা ও তাপ্তীর মত মধ্যভারতীয় পর্বতাঞ্চলে উৎস। পশ্চিমে বয়ে গিয়ে তারা আরবসাগরে পড়ছে। পশ্চিমদিকে যে নদীগুলি বইছে, সেগুলি সাধারণত শৈলশিরা বা উঁচু ও খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বইছে। তাদের মোহনায় কোন ব-দ্বীপ সৃষ্ট হয় না। পূর্বগামিনী নদীগুলির বৈশিষ্ট্য হল বড় বড় ব-দ্বীপ পুঞ্জ। ভারতের পূর্ব উপকূলবলয় এই নদীগুলির ব-দ্বীপের দৌলতে উর্বর হয়েছে।

উত্তর পেন্নার ও দক্ষিণ পেন্নার

পেন্নার নদীর (আরেকটি নাম পিনাকিনী) উৎপত্তি মহীশূরে নন্দীদুর্গা পাহাড়ে। তার শাখা দুটি। 560 কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর পেন্নার অন্ধ্রপ্রদেশের কড্ডাপ্পা অনন্তপুর ও নেলোর জেলা দিয়ে বয়ে গিয়ে নেলোর শহরের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়ছে। 620 কিলোমিটার দীর্ঘ দক্ষিণ পেন্নার

প্রথমে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর জেলা ও পরে তামিলনাড়ুর সালেম ও দক্ষিণ আর্কট জেলা দিয়ে বয়ে গিয়ে কুড্ডালোরের উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পড়ছে।

পেন্নারের এক বৈশিষ্ট্য হল হঠাৎ, কোন জানান না দিয়েই বান ডাকা। অগভীর বদ্ধস্রোত এক নদীতে নিমেষে দুকূল ছাপিয়ে বান ডাকে। একটি প্রবাদ আছে : 'ঘি না গলতে পেন্নারে বান ডাকে!' ঠিক তাইই ঘটে। যদিও পেন্নারের দুটি শাখাতেই বছরে বড় জোর দু মাস জল থাকে। নেলোরের কাছে পেন্নারে 1885 সালে একটি বাঁধ দেওয়া হয়। পরে সেটির উন্নতিসাধন করেন আমাদের পূর্ব পরিচিত স্যার আর্থার কটন। তারপর চাষের কাজে নদীর জল পাওয়ার জন্য অনেক খাল কাটা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর ভেতর যখন দক্ষিণ পেন্নার বইছে তখন তাতে খুব কম জল থাকার অন্যতম কারণ হল, কর্ণাটক রাজ্যের ভেতর এই নদীর যে 104 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যটি আছে, তার ওপর এত বেশি বাঁধ তৈরী করা হয়েছে যে তামিলনাড়ুতে কম জলই পৌঁছতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে তামিলনাড়ুতে এর সঙ্গে কয়েকটি উপনদী যোগ দেয়। ফলে সেচকার্যের পক্ষে এর কার্যকারিতার উন্নতি ঘটে।

পালার

তামিল ভাষায় 'পালার' শব্দের অর্থ হল দুধের নদী। কিন্তু পালার একটি শুষ্কপ্রায় শীর্ণ নদী। এ নদীর মজা হল, নদীগর্ভের যেখানেই খোঁড়া যাক, একটি টাটকা জলের ঝরনা পাওয়া যায়। যে কর্ণাটকে এর উৎপত্তি, সেখানে এ নদীকে অনেক বেশি কাজে লাগানো হয়। যে তামিলনাড়ু দিয়ে এ নদী পরে বয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। এ নদীর কূলের নিসর্গদৃশ্যের বিশিষ্টতা হল আম, নারকেল ও ক্যাসুরিনা গাছ।

ইতিহাসেও পালারের একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে। দুই রেড্ডি সামন্ত-সর্দার বোম্মি রেড্ডি ও থিম্মা রেড্ডির ষোড়শ শতকে তৈরি একটি দুর্গের পরিখা জলে ভরবার জন্য পালারের জল ব্যবহার করা হয়েছিল। পালার যেখানে সমুদ্রে পড়ছে সেই চতুরঙ্গপত্তনম এক সময়ে ওলন্দাজ অধিকারে ছিল।

একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আমাদের ইতিহাসের এই অধ্যায়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে সময়ে এই ছোট শহরটি মসলিন কাপড়ের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। আজ এ শহর মাছের ব্যবসার জন্যে সুপরিচিত।

শরাবতী

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এক সুউচ্চ মালভূমিতে শরাবতীর উৎপত্তি। এই নদীর বুকেই আছে বিখ্যাত যোগ জলপ্রপাত। একটি খাড়া পাহাড়ের কিনার দিয়ে নদীটি উছলে নামছে ধাপে ধাপে চারটি পাথরের থাক বেয়ে। শেষ ধাপে 253 মিটার নামছে। এই শেষ ধাপটি যোগ বা গারসোপ্পা জলপ্রপাত নামে পরিচিত। অবশ্যই এটি ভারতের এক সুন্দরতম জল-প্রপাত। পাথরের চারটি থাকের নাম হল রাজা, রোরার, রকেট ও রানী। জলপ্রপাতটির উপত্যকা জুড়ে মানুষের ছুটি কাটাবার জন্যে বিশ্রামভবন ও অতিথিশালা তৈরি করা হয়েছে। দর্শকের দল কোন বিশ্রাম ভবনের বারান্দায় বা বাগানের সবুজ ঘাসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলপ্রপাতটির দিকে চেয়ে আছেন এ দৃশ্য মোটেই বিরল নয়। জলপ্রপাতটির চূড়ার খুব কাছে ওঠা যায়। একটি প্রপাতধারার পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় যোগের স্ফটিক স্বচ্ছ জল পাহাড়ের ওপর থেকে হুড়মুড়িয়ে নিচে নামছে, নিচ থেকে ওপর পানে অর্ধেক পাহাড় পর্যন্ত ছিটিয়ে দিচ্ছে ফেনার উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা।

কেরালার নদী

ভারত ইউনিয়নের দক্ষিণতম রাজ্য হল কেরল। এই ছোট রাজ্যটিতে আছে চল্লিশটিরও বেশি নদী, সেগুলির উপনদী, আবার উপনদীগুলির শাখা। রাজ্যটি জলের জালে ঢাকা। বেশির ভাগ নদীই অবশ্য সামান্য স্রোতস্বিনী। কতকগুলি আবার শুধু বর্ষাকালেই বয়। রাজ্যের দুটি বৃহত্তম নদী হল ভারতপুজা ও পেরিয়ার।

পশ্চিমঘাট গিরিমালার শিবগিরি পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে পেরিয়ারের

উৎস। 225 কিলোমিটার দীর্ঘ নদীটি কোচিনের উত্তরে আরবসাগরে পড়ছে। মোহনা থেকে ভেতর দিকে উজান পথে 160 কিলোমিটার অবধি এ নদী নাব্য। ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়ে একটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ের ভেতর একটি সুড়ঙ্গ কেটে নদীটির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে পূবদিকে বহানো হয়েছে। এই সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ হল 1766 মিটার। যে বছর সুড়ঙ্গটি কাটা হয়, সেই 1895 সালের পক্ষে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এক বিরাট কৃতিত্ব। এই গিরি-সুড়ঙ্গ দিয়ে গিয়ে নদীটি তামিলনাডুর মাদুরাই জেলা দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে বৈগাই নদী এর সঙ্গে মিশে মাদুরাই জেলার মাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়ার আগে পেরিয়ারের বেশি জলটাই অপচয় হত।

পেরিয়ার বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য, ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়ের কাছে বাঁধ তৈরির ফলে যে জলাধার সৃষ্টি হয়েছে তারই তীরে অবস্থিত। সমস্ত ভারতের অভয়ারণ্যগুলির মধ্যে খ্যাতিতে এটি অন্যতম প্রধান। শুধু দেশের সর্বত্র থেকেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র থেকে পর্যটক ও দর্শকরা এখানে বন্য প্রাণী দেখতে আসেন। হাতির পাল, বুনো মোষ, বাঘ ও ভালুক যখন হ্রদে স্নান করতে ও জল খেতে আসে, তখন মোটরবোটে চড়ে গিয়ে দর্শকরা তাদের দেখতে পারেন। এখানকার ভূ-প্রকৃতিকে অতি যত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে এ অঞ্চলের বন্য প্রাণীগুলি স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতে পায়।

কেরলে পম্পা নামে আরেকটি নদী আছে। কোল্লাম জেলার পাহাড়ে উৎস, এমন অনেক পাহাড়ী নদী মিলে মিশে নদীটি সৃষ্টি করেছে। নদীটি মাত্রই 144 কিলোমিটার দীর্ঘ। কুট্টানাদ, যার নাম কেরলের ধানগোলা, তাতে জলসেচ করে পম্পা। ওনাম উৎসব উপলক্ষে বাৎসরিক নৌকো বাচের জন্যও নদীটি বিখ্যাত। এই বাচ দৌড়ে যে সাপের মত লম্বা নৌকো-গুলো ব্যবহার হয়, তার প্রত্যেকটিতে একশোর বেশি লোক ধরে। প্রতিযোগীরা দাঁড়ের বদলে বৈঠা ব্যবহার করে। নদীকূলে যারা বাস করে, তারা সবাই এই নৌকো দৌড়ের উৎসবে যোগ দেয়। উৎসবটি কেরলে জীবন ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ।

কেরলের পশ্চাদভাগে জলধারাসমূহ
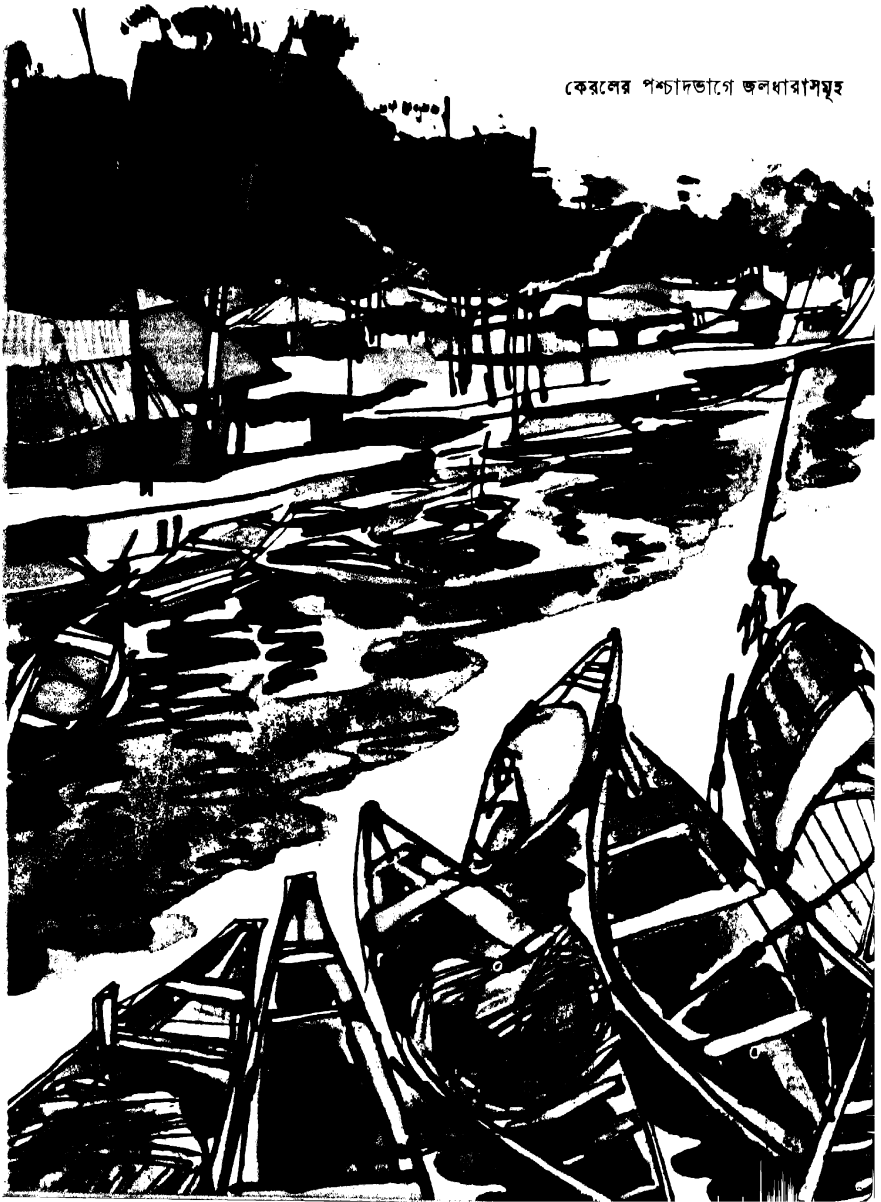
পেরিয়ার বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য

তামিলনাড়ুর তিনটি নদী

তামিলনাড়ুতে মাদুরাই হল দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এক সময়ে শহরটি পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী ছিল। বহু শতাব্দী ধরে এটি তামিল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কেন্দ্র। এখানেই আছে সেই চারটি বিশাল মন্দিরচূড়া বা 'গোপুরম' বিশিষ্ট বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির। এই শহর দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট নদী বৈগাই,

মাত্র 260 কিলোমিটার লম্বা। পশ্চিমঘাটের কার্ডামোম পাহাড় সংলগ্ন বর্ষা উপত্যকায় এ নদীর উৎস। পক প্রণালীতে নদীটি সমুদ্রে পড়ছে। বর্ষাকালে নদীটি ভেসে যায়। বছরের শেষ তিনমাসে শুকিয়ে যায়। কেরলের নদী পেরিয়ার এসে এ নদীতে মিশছে বলে বৈগাই তামিলনাডুর মানুষের কাজে তবু খানিকটা লাগে।

বিখ্যাত তামিল মহাগ্রন্থ 'শিলাপ্পাধিকরম' এ কবি ইলাঙ্গো কাব্যময় সৌন্দর্যে বৈগাইয়ের প্রবহমান জলধারার বর্ণনা করেছেন। তিনি বৈগাইকে তুলনা করেছেন একটী তরুণীর সঙ্গে। নদীর মাঝখানে বালির চরের লাল ফুলগুলি মেয়েটির ঠোঁট। জলে ভাসন্ত সাদা যুঁইফুলগুলি তার চোখ। যে কালো বালুচরে নদীর ঢেউ মাথা কুটছে, তা মেয়েটির চুল, ইত্যাদি। অতীতদিনে বৈগাইয়ের বুকে যে নৌকোগুলি ভাসত, অতি সুন্দর কারুকাজ তাদের। ঘোড়া, হাতি বা উটের মাথার আকারে নৌকোর গলুই তৈরি করা হত।

একসময়ে তামিল দেশে শৈব ও জৈনরা শ্রেষ্ঠত্ব পাবার জন্য লড়াই করেছিল। এক ধর্মের চেয়ে আরেক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য তখন মানুষ বৈগাইয়ের জলকে কাজে লাগাত। প্রতিদল স্ব স্ব ধর্মের বিশিষ্ট নীতি ও সূত্রগুলি তালপাতায় লিখে জলে ফেলে দিত। মনে করা হত যে ধর্মটি শ্রেষ্ঠ, তার নীতি লেখা তালপাতাটি স্রোতের উল্টো মুখে নদীতে উজান বেয়ে চলে যাবে। এটি গল্প তাতে সন্দেহ নেই, তবে কি সুন্দর গল্প !

তামিলনাডুতে একটি নদী আছে। তার সমস্ত দৈর্ঘ্যটি একটি জেলার সীমানার মধ্যে বদ্ধ। সে হল তাম্রপর্ণী। এর উৎস হল পশ্চিমঘাটে পোঢ়ি-গাই পাহাড়ের চূড়ায় 1838 মিটার উচ্চতায়। তাম্রপর্ণী মাত্র 120 কিলোমিটার দীর্ঘ। এই একশো কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে 24 কিলোমিটার

মীনাক্ষী মন্দির
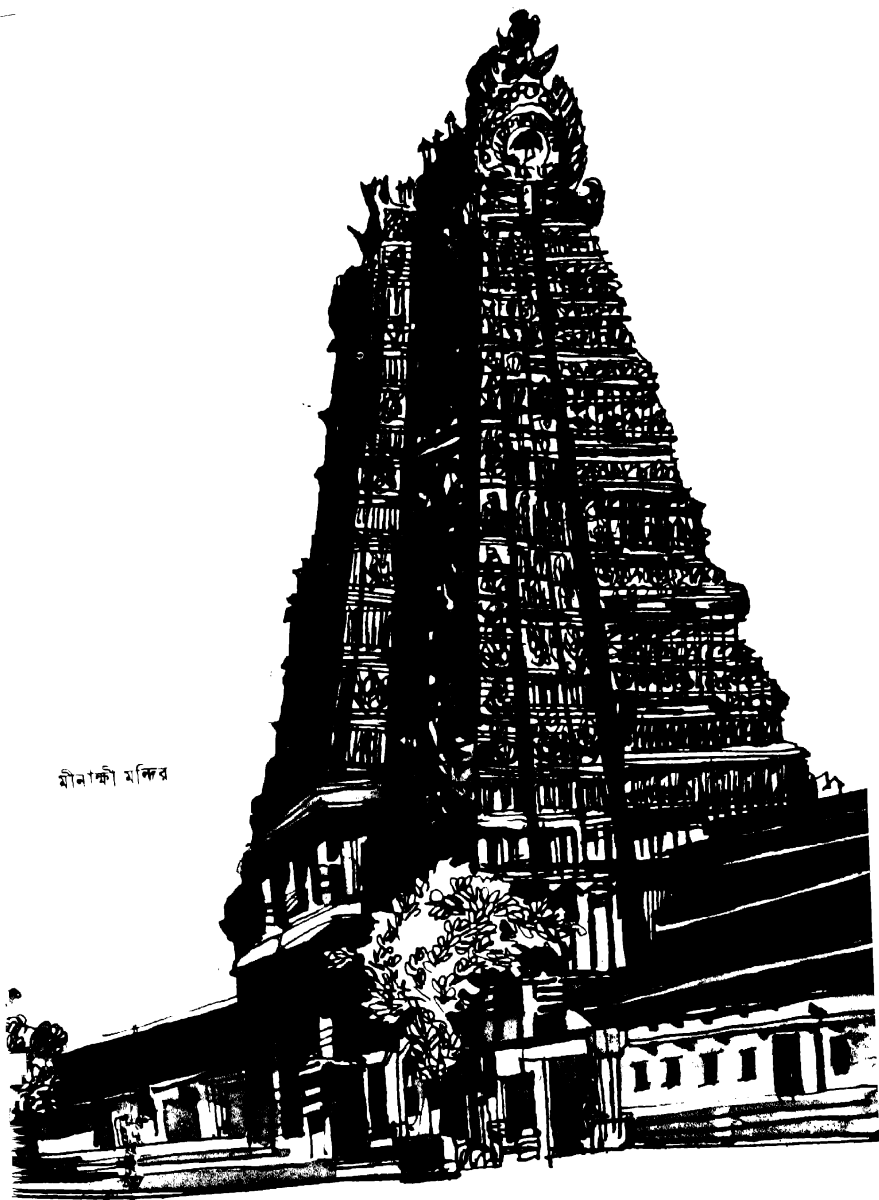
হল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। নদীর বাকি দৈর্ঘ্যটি সেচের কাছে বহুল ব্যবহৃত হয়। যে জেলায় নদীটি অবস্থিত, সেই তিরুনেভেলি জেলা খুব উর্বর ও সমৃদ্ধ। বলা হয়, যেহেতু এই নদীর জলে তামা আছে, (সংস্কৃতে তাম্র) সেহেতু নদীটির নাম তাম্রপর্ণী।

যে পাহাড়ে এই নদীটির উৎস, সেটি তামিল কাব্যসাহিত্যে খুবই
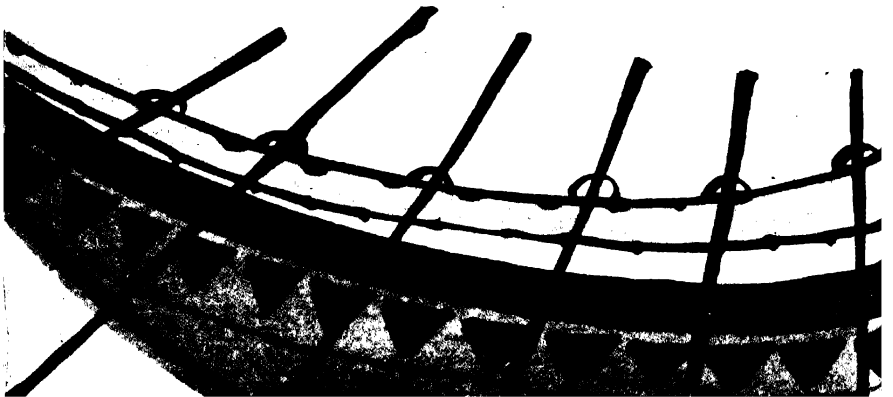
প্রশংসিত। 'যে পাহাড়ের মাথায় চাঁদের মুকুট আছে', বা 'যে পাহাড়ের ওপর দক্ষিণা বাতাস নাচে', এইভাবে পাহাড়টিকে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু

পূবালী বর্ষা ও পশ্চিমা বর্ষা দুইই এই গিরিমালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেহেতু বছরের অনেকগুলো মাসই পাহাড়ের চূড়া মেঘপুঞ্জে ঢাকা থাকে। শরতে জায়গাটি অতি মনোরম। তখন এখানে ছুটি কাটানো ভারি আরামের। পোটিগাই পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে যাত্রাপথ, তাতে তাম্রপর্ণী বহু জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। এই জলপ্রপাতগুলির মধ্যে বৃহত্তমটির উচ্চতা হল 90 মিটার। কল্যাণতীর্থম নামে একটি জায়গায় এটি অবস্থিত।